কর্পোরেট পুঁজির সেবাদাস নয়,
মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু ...
সংগ্রামী হাতিয়ার
EMPLOYEES' FORUM
গ্রাহক ও পাঠক হোন
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি
কেন্দ্রীয় কমিটি

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

তীব্র জলসংকট দেশের বিভিন্ন প্রান্তে

জুন, ২০১৯ ■ ৪৮তম বর্ষ ■ দ্বিতীয় সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত

রাজ্য কো- অর্ডিনেশন কমিটির ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য গত ১৪ জুলাই বর্ধমান শহরের কর্মচারী ভবনে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। ঐ সভায় রাজ্য সম্মেলনের 'লোগো' উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। ঐ একই দিনে সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত দান মেলায় ১০ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হয়। জেলা সদরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান মেলায় অংশ নেন। *(বিস্তারিত সংবাদ পরের সংখ্যায়)।*

রাজ্য সম্মেলনের ' লোগো' উদ্বোধন করছেন (বাঁদিকে) এবং বক্তব্য রাখছেন (ডানদিকে) সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ

১৪ জুন ২০১৯ তিন দফা দাবীতে

রাজ্যব্যাপী দু'ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগনা

জলপাইগুড়ি

বীরভূম

মধ্যাঞ্চল

বর্ধমান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে গত ১৪ জুন ২০১৯ সারা রাজ্যে কর্মচারী বন্ধুরা তিন দফা দাবিতে দু'ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২৭ মে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ পুনরায় সাত মাস বৃদ্ধি করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তার প্রতিবাদে গত ২৮ মে সংগঠনের ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত শামিল হয়েছিলেন কয়েক হাজার কর্মচারী। ১৪ জুন, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকরী করা এবং নীতিহীন প্রতিহিংসামূলক সমস্ত বদলীর আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবিতে সারা রাজ্যে বেলা দেড়টা থেকে শুরু করে দু'ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়। প্রতিটি জেলা সদর ছাড়াও বিভিন্ন মহকুমায় এবং কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ভবনগুলির সামনে এই কর্মসূচীতে কর্মচারীদের অংশ গ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। □

কর্মচারী স্বার্থে পরিচালিত
সংগ্রাম - আন্দোলনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে
যে কোন পরিস্থিতিতে অবিচল সংগঠন
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির
ঊনবিংশতিতম
রাজ্য সম্মেলনের
তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচী
জুলাই - আগষ্ট মাসের বেতন থেকে সফল করুন
(তহবিলের হার ঃ মোট বেতন ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকা, তদুর্দ্ধে ২০০ টাকা)
কেন্দ্রীয় কমিটি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনিশতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ বর্ধমান শহরে। ১৪ জুলাই এই উপলক্ষে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের কাজ ইতিমধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। ঐ দিনেই রাজ্য সম্মেলনের আয়োজক সংগঠনের বর্ধমান জেলা কমিটি দান মেলার কর্মসূচীও প্রতিপালন করেছে। ঐ কর্মসূচীতে ঐ জেলার কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বন্ধুরা সতঃস্ফূর্তভাবে সম্মেলন তহবিলে তাঁদের অনুদান প্রদান করেছেন। পাশাপাশি সম্মেলনকে সফল করার জন্য মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সংগঠনের রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী সারা রাজ্যজুড়ে সম্মেলন তহবিল সংগ্রহের ডাক দেয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠন- আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সম্মেলন তহবিল সংগ্রহের কাজটিকেও সফল করতে সর্বত্র প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে। □

২৮ জুন, ২০১৯

বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা সংগঠনের

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনার পথে
বিজয় শংকর সিংহ ও বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী

রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর প্রথম দফার (২০১১) শুরুতেই যখন বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন, তখনই, সেই সভাতেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, রাজ্য সরকার যদি জনস্বার্থে ও কর্মচারী স্বার্থে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে সেই সমস্ত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সংগঠনের পক্ষ থেকে সবসময় সহযোগিতার হাতে প্রসারিত করা হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি জনস্বার্থ ও কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত সমূহের বিরোধিতা করতেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না সংগঠন। মুখ্যমন্ত্রী সেই সভাতেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং কর্মচারীরাও তাঁদের অর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে পূর্ণরূপে ভোগ করতে পারবেন। যদিও পরবর্তী সময়ে ঐ প্রতিশ্রুতি নিছক পরিহাসে পরিণত হয়েছে। কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া সময় মতো পূরণে অস্বীকৃতির পাশাপাশি, পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্ব-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে এলেও, সংগঠন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সাথে প্রথম আলোচনার সুযোগেই যে কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে এসেছিল, পরবর্তী বছরগুলিতে সেভাবেই ভূমিকা পালন করেছে। মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের মতো অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া পূরণে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অনীহা ও বঞ্চনা এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। একের পর এক। উত্তরে আলিপুরদুয়ার থেকে দক্ষিণে কাকদ্বীপ পর্যন্ত সংগঠনের ডাকে পথে নেমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন কর্মচারীরা। নবান্ন ও বেতন কমিশন দপ্তর অভিযানের মত একাধিক কর্মসূচীর পাশাপাশি, কলকাতা ও জেলাসদরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী, ব্লক ও দপ্তরভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত আন্দোলন-সংগ্রাম কর্মসূচী উপর্যুপরি গ্রহণ করেছে সংগঠন। এমনকি প্রতিপালিত হয়েছে সারারাত ব্যাপী গণঅবস্থানের কর্মসূচীও।

সংগঠন এই সময়কালে নিরন্তর 'স্ট্রাগল'-এর কর্মসূচী গ্রহণ করার সাথে সাথে 'পারস্যুয়েশন'-র কাজটিও করেছে কোনো ধরনের ফাঁক না রেখেই। বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেওয়া হয়েছে অর্ধশতাধিক পত্র। 'পারস্যুয়েশন' ও 'স্ট্রাগল' এই দ্বিবিধ ভূমিকা পালনে সংগঠনের হার না মানা মনোভাব উদ্বুদ্ধ করেছে সব অংশের কর্মচারীদেরই। গত ২৭ মে পুনরায় বেতন কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে, সংগঠন সারা রাজ্যব্যাপী ২৮ মে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালন করে। ১০ জুন তারিখে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী সমীপে পত্র দেওয়া হয়। ১৪ জুন সারা রাজ্যে হয় দু'ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী।

সংগঠনের এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই, অবশেষে কিছুটা ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে বাধ্য হয় সরকার। গত ২৯ জুন বিধানসভার অধিবেশন চলার ফাঁকে,

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

সম্পাদকীয়

রাজ্য রাজনীতির নতুন সমীকরণ

যদি আমরা কোনো একজন সাধারণ কর্মচারীর কথা ভেবে নিই, যিনি নিজের পারিবারিক বৃত্তের বাইরের কথা খুব বেশি ভাবতে চান না, যিনি দাবি, অধিকার ইত্যাদি বলতে শুধুমাত্র নিজের পেশার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে এমন দাবি বা অধিকারই (যেমন মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন প্রভৃতি) শুধু বোঝেন। এমনকি এগুলির কার্যকারণ সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনাকেও 'রাজনীতি ভাল্লাগে না' বসে সন্তর্পণে এড়িয়ে যান। যাঁর কাছে নিজের পেশার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের বাইরের সময়টা, শুধুমাত্র বিনোদন ও বিশ্রামের সময়—এহেন আমাদের একজন কর্মচারী বন্ধুও বিশ্ব ও দেশের রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি নিয়ে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়র কপাট বন্ধ রাখলেও, রাজ্যের রাজনৈতিক টানাপোড়েন নিয়ে অন্ততপক্ষে চোখজোড়া ও কানজোড়া খোলা রাখেন। কারণ তিনি এটুকু বোঝেন, তাঁর সমগ্র আকাঙ্খা, আগ্রহ ও উদ্বেগ যে গুটিকয়েক দাবির ওপর কেন্দ্রীভূত, সেগুলি নাগালের মধ্যে থাকা বা না থাকাটা নির্ভর করে রাজ্য রাজনীতির বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতির গতিপ্রকৃতির ওপর। তাই আগ্রহ বা উদ্বেগকে মাথায় রেখেই, রাজ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্রে রেখে কিছু আলোচনার অবতারণা অপ্রসাঙ্গিক হবে না বলেই মনে হয়।

এবারের লোকসভা নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফল তো বটেই, এমনকি পোস্টাল ব্যালটের ফল থেকেও এটা স্পষ্ট যে, রাজ্যে রাজনৈতিক বিন্যাসে এযাবৎকাল 'টেইল-এন্ডার' একটি শক্তি দ্রুত সামনের সারিতে চলে এসেছে। অবশ্য এদের শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া, নিজেদের উপস্থিতিকে জানান দেওয়ার সামর্থ তারা অর্জন করেছিল বেশ কিছু দিন আগেই। কিন্তু, সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই শক্তির যে সাফল্য, তাকে 'টি-টোয়েন্টি' ক্রিকেটে স্লগ ওভারের ধুন্ধুমার ব্যাটিং-এর সাথে তুলনা করাই যায়। এই অনেকটাই অপ্রত্যাশিত সাফল্যের কারণ কী তা নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ জরুরি। আলোচনা শুরুও হয়েছে বিভিন্ন মহলে, এবং মিডিয়াতে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠিত এই আলোচনাগুলির চরিত্রও 'ডাইভারজেন্ট'। এবং সেটা স্বাভাবিকও। 'কারণ' সম্পর্কিত বহমান তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আমাদেরও রয়েছে, প্রয়োজনও আছে। তবুও এখনই এই প্রসঙ্গে প্রবেশ না করে, বা এ সম্পর্কে আলোচনার ভিন্ন অবকাশ রেখে, আমরা বরং একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে পারি।

পাঠক বন্ধুদের সুবিধার জন্য আলোচনা প্রসঙ্গটির একটি শিরোনামও দেওয়া যেতে পারে—'বিকল্প' মানে কী? স্বাধীনতা উত্তরকালে, একেবারে পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষ 'বিকল্প' বা 'অলটারনেটিভ' বলতে যা বোঝেন, এবং ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের মানুষ (অবশ্যই কেরালা ও ত্রিপুরা বাদে) 'বিকল্প' বলতে যা বোঝেন—এই দুই 'বিকল্প'-র মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। কারণ স্বাধীনতার পর থেকেই এ রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ হলো 'বাম' বনাম 'দক্ষিণ'। এখানে যখন দক্ষিণপন্থী শক্তি প্রশাসন পরিচালনা করেছে, তখন বামেরা থেকেছে বিরোধী আসনে (আলোচনার ক্ষেত্রটিকে ছোট করার জন্য শুধুমাত্র সংসদীয় কাঠামো ভিত্তিক আলোচনা করা হচ্ছে), আবার বামেরা যখন প্রশাসন পরিচালনা করেছে তখন দক্ষিণেরা থেকেছে বিরোধী আসনে। বাম ও দক্ষিণ উভয় শিবিরেরই অভ্যন্তরীণ শক্তি বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে এই সময়কালে। যেমন গত শতাব্দীর ষাটের দশকে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্ট এবং সত্তরদশকে গড়ে ওঠা বামফ্রন্টের বিন্যাসগত যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। এমনকি দক্ষিণপন্থী শক্তি হিসেবে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেও নিশ্চয়ই, যেমন মিলও রয়েছে, তেমনই কিছু অমিলও রয়েছে। এটাও ঠিক, বাম-দক্ষিণ বিভাজন রেখাটা ক্ষেত্রবিশেষে অস্পষ্ট ছিল। যেমন যুক্তফ্রন্টে বামপন্থীদের পাশাপাশি দক্ষিণপন্থী দলও যুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রক শক্তি ছিল বামপন্থীরাই। আবার অপরদিকে সত্তরের দশকে, এমনকি জরুরি অবস্থার সময়েও জাতীয় কংগ্রেস নামক দক্ষিণপন্থী দলটির সাথে বামপন্থী শক্তির একাংশের সহাবস্থান ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক শক্তি ছিল দক্ষিণপন্থীরা। আমরা যদি আরো কিছুটা এগিয়ে ২০০৮, ২০০৯ বা ২০১০—এই সময়টাকে দেখি, তাহলে দেখব মূল বামশক্তি সমূহের জোটের বিরুদ্ধে একটা নীতি বিবর্জিত রামধনু জোট গড়ে উঠছে, যেখানে দক্ষিণ, অতি দক্ষিণ, অতি বাম সকলেরই ঠাঁই হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও নেতৃত্বে ছিল দক্ষিণপন্থীরা।

এক কথায় বিভাজন রেখার অস্পষ্টতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ বাদ দিলে, পশ্চিমবাংলায় বাম বনাম দক্ষিণ এই রাজনৈতিক সমীকরণটির কখনও অন্যথা হয়নি। এটাই ছিল পশ্চিমবাংলার 'পলিটিক্যাল ডিএনএ' (সম্প্রতি কর্পোরেট মিডিয়ার একাংশ এই শব্দযুগল ব্যবহার করেছে)। এই প্রেক্ষাপটে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের কয়েকমাস আগে থেকে কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত মিডিয়ায় যে প্রচারের ঝড় তোলা হয়েছিল, তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্যটি হলো, পশ্চিমবাংলায় এযাবৎকাল বহমান রাজনৈতিক সমীকরণটিকে ঘেঁটে দেওয়া। এই কারণেই কয়েকমাস আগে থেকে রাজ্যের দক্ষিণপন্থী শাসকদলের বিরোধী মূল শক্তি হিসেবে বা বিকল্প হিসেবে অতি দক্ষিণপন্থী কেন্দ্রের শাসক দলটিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শুধু প্রচারের আলোয় আনলেই তো হবে না। ২০১১ পরবর্তী সময়ে বিরোধী শক্তি হিসেবে বামপন্থীরা ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ জনসমাজের যে অংশটি নীতিগত কারণে স্থায়ীভাবে শাসকদলের বিরোধী (যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা স্বাভাবিক চিত্র) এবং শাসকদলের বিভিন্ন জনবিরোধী কার্যকলাপের জন্য বীতশ্রদ্ধ হয়ে, যাঁরা তাঁদের পূর্বের শাসকদলের পক্ষের অবস্থান থেকে বিরোধী অবস্থানে চলে আসছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী শক্তি হিসেবে বামশক্তির পক্ষে চলে আসছেন—এই দুই অংশকেই টেনে আনতে না পারলে, এমনকি সাময়িকভাবে হলেও, সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। তাই প্রচার শুরু হলো, বামপন্থীরা এখন রাজ্য রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক। লোকসভা নির্বাচনের ফল যদি একটা মাপকাঠি হয়, তাহলে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, উল্লিখিত প্রচার কৌশল অনেকাংশেই সফল হয়েছে। নির্বাচনে প্রাপ্ত জনসমর্থনের নিরিখে এখন রাজ্যে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তিই প্রধান বিরোধী শক্তি। এই পরিকল্পনার যারা প্রকৃত মাথা তারা এবং তাদের বশংবদ কর্পোরেট মিডিয়া পরিকল্পনামাফিক সাফল্য পেলেও, খুব বেশি আহ্লাদিত হতে পারছে না নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে। কারণ রাজ্যের শাসকদলটি দক্ষিণপন্থী হলেও, দক্ষিণপন্থী ট্র্যাডিশনাল রাজনৈতিক দল বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু নয়। এই দলটি কার্যত কিছু ক্ষমতালোভী, সুযোগসন্ধানী, অসামাজিক কার্যকলাপে অভ্যস্ত, নীতি ও আদর্শবিহীন কিছু মানুষের সংঘ। ফলে নির্বাচনে হাওয়ার অভিমুখ অনেকটা বদলের সাথে সাথে, ক্ষমতা লিপ্সায় উল্টোদিকে ঝাঁপ মারা শুরু হয়েছে। স্বভাবতই কর্পোরেট মিডিয়ার কপালে ভাঁজ পড়ছে। কী হবে, এত যত্ন করে গড়ে তোলা রাজনৈতিক সমীকরণ, বামেদের প্রান্তিক করে ফেলার চেষ্টা টিকবে তো? যেভাবে দলবদল শুরু হয়েছে, তাতে শেষপর্যন্ত কি দাঁড়াবে, তা নিয়ে মিডিয়া আতঙ্কিত। তাই এখন কিছুটা সুর বদল করে শুরু হয়েছে উভয়পক্ষের মৃদু সমালোচনা। লক্ষ্য একটা ভারসাম্য ধরে রাখা, যাতে দক্ষিণ বনাম অতি দক্ষিণ সমীকরণটিকে রাজ্যের বুকে স্থায়ী চেহারা দেওয়া যায়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করতে গিয়ে, সনাতন বুর্জোয়া রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলিকেও ধ্বংস করা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধিতা বলতে কী বোঝায়, এ সম্পর্কিত কেতাবী ধারণাকেও পাল্টে দেওয়া হয়েছে। যেমন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের গঠনমূলক ভূমিকা আ-বিশ্ব স্বীকৃত। আমাদের দেশেও তার অন্যথা হওয়ার কথা নয়। বিরোধী দল বা বিরোধী শক্তি সরকারের জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের সমালোচনা করবে, মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলন করবে, জনমত গঠন করবে—এই স্বাভাবিক সংবিধানসম্মত প্রক্রিয়াটিকেও এ রাজ্যে গুরুত্বহীন করে ফেলা হলো। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক সহ সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থে, সংগ্রাম-আন্দোলন গড়ে তোলা, যেমন বিপিএমও-র জাঠা, সিঙ্গুর থেকে নবান্ন কৃষক জাঠা, ৮-৯ জানুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘটের দিনে এ রাজ্যে সফল ধর্মঘট প্রভৃতি কোনো কিছুই নাকি ঠিক বিরোধিতা নয়। বিরোধিতা হলো, দক্ষিণপন্থী ও অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি, ব্যক্তি আক্রমণ, কুৎসা ইত্যাদির লোক দেখানো লড়াই। এই যে নতুন রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিকে এ রাজ্যের বুকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে, এর পেছনেও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্যটি হলো—নির্বাচন আসবে-যাবে, সাধারণ মানুষও ভোট দেবেন, কিন্তু কখনোই যেন তাঁরা নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির চাওয়া-পাওয়ার হিসেব কষে ভোট না দেন। বরং মানুষ ভোট দিক, কে কত জোরে গলাবাজি করতে পারলো বা কার দলে বাহুবলীর সংখ্যা বেশি তা বিচার করে। এর একটা সুবিধার দিক হলো সরকার পাল্টালেও নীতি পাল্টাবে না। নয়া উদারবাদ এটাই চায়। এক কথায় জনগণ ভোট দিক, কিন্তু তাঁরা ভোট দিক ডি-পলিটিক্যালাইস্‌ড্ মানসিকতা নিয়ে। পাশাপাশি জনগণের চিন্তা-চেতনা থেকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, সেই শূন্যস্থানে নিয়ে আসা হচ্ছে ধর্মীয় মেরুকরণ ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে। যা পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনকি ডঃ অমর্ত্য সেনও পশ্চিমবাংলার এই নয়া রাজনৈতিক (অপ) সংস্কৃতি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। শুধু যে এক ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমদানি করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা-ই নয়, এর হেজিমনি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই হেজিমনিকে ভাঙতে হলে পশ্চিমবাংলার চিরায়ত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই জোরদার করতে হবে। □

১৫ জুলাই, ২০১৯

কমরেড ভবতোষ বসু

হুগলী জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির শ্রীরামপুর মহকুমার প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড ভবতোষ বসুর জীবনাবসান ঘটেছে। বিগত ১১ জুন ২০১৯ সকালে হিন্দমোটরস্থিত একটি বেসরকারী হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। সাম্প্রতিককালে তিনি নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন।

কমরেড ভবতোষ বসু ১৯৬২ সালের ৮ জুলাই রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে হেল্‌থ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকুরিতে যোগদান করেন। ২০০৩ সালের ৩১ জানুয়ারি শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লকের কানাইপুর বি পি এইচ সি থেকে ব্লক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরি জীবনের শুরুতে তিনি নন্-মেডিকেল টেকনিক্যাল পার্সোনাল এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৪ সালে বিভেদকামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওয়েস্টবেঙ্গল নন্-মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন গঠিত হলে কমরেড ভবতোষ বসু সেখানে যুক্ত হন। সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকেই কমরেড বসু ছিলেন অগ্রণী কর্মী। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হন এবং সংগঠনের মুখপত্র 'ব্রতী ত্রৈমাসিক'-র সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব প্রতিপালন করেন।

চাকুরি জীবনের শুরু কলকাতায় হলেও ১৯৭০ সালে তিনি হুগলী জেলায় বদলী হন এবং জেলার কর্মচারী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৯৯ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির শ্রীরামপুর মহকুমা শাখার দ্বাদশ সম্মেলনে তিনি মহকুমার সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেলার শ্রমিক -কর্মচারী-শিক্ষক যুক্ত আন্দোলনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত মুখ। ২০০২ সালে শ্রীরামপুর মহকুমা

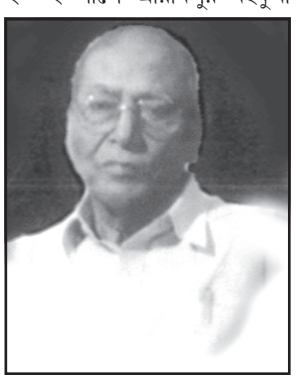

১২ই জুলাই কমিটির ষষ্ঠ সাংগঠনিক কনভেনশনে তিনি শ্রীরামপুর মহকুমা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী সংগঠক, একজন সচেতন মানুষ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রতীক।

গত ৫ জুলাই ২০১৯ শ্রীরামপুর টাউন হলে তিন শতধিক কর্মচারী ও পেনশনার্সদের উপস্থিতিতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে কমরেড ভবতোষ বসুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভার শুরুতেই প্রয়াত কমরেড ভবতোষ বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-র সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া, ডব্লু বি এন এম টি ই এ-এর সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা সুশীল ব্রহ্ম, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে সুধাংশু কুণ্ডু, জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত, ১২ই জুলাই কমিটির মহকুমা আহ্বায়ক নিরঞ্জন সরকার, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি শ্রীরামপুর মহকুমার সম্পাদক দেবাশীষ তালুকদার, ডব্লু বি এন এম টি ই এ-এর জেলা সম্পাদক সুজিত চ্যাটার্জী মুখপত্র 'ব্রতী ত্রৈমাসিক'-র পক্ষে উক্ত সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক অরুণ দে, কমরেড বসুর পরিবারের পক্ষে তাঁর স্ত্রী শুক্লা বসু ও কন্যা পারমিতা বসু প্রমুখ। স্মরণসভায় কমরেড ভবতোষ বসুর স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন সুধাংশু কুণ্ডু, শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত, মানস কুমার বড়ুয়া, শান্তনু ভট্টাচার্য, সৌরীন বসু (জেলা ১২ই জুলাই কমিটি) এবং কমরেড ভবতোষ বসুর স্ত্রী শুক্লা বসু।

স্মরণসভা পরিচালনা করেন বলরাম বর্মন (সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি), স্বপন বেরা (ডব্লু বি এন এম টি ই এ), সুধাংশ কুণ্ডু (১২ই জুলাই কমিটি) এবং প্রতাপ মান্না (সভাপতি, জেলা পেনশানর্স সমিতি)-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

শোক সংবাদ

গিরীশ কারনাড

প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যব্যক্তিত্ব গিরীশ কারনাড। বেঙ্গালুরুতে নিজের বাসভবনে ১০ জুন সকালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে চলচ্চিত্র ও নাট্য জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গিরীশ কারনাড ১৯৭৪ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৯২ সালে পদ্মভূষণ ও ১৯৯৮ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৭১ সালে সেরা পরিচালক, ১৯৭৭ সালে সেরা চিত্র নাট্যকারের সম্মান পান। শুধু অভিনয়ই নয়, পরিচালক হিসেবে গিরীশ কারনাড দেশে-বিদেশে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন।

গিরীশ রঘুনাথ কারনাডের জন্ম ১৯৩৮ সালে বর্তমান মহারাষ্ট্রের ম্যাথেরানে। গিরীশ কারনাডের বাবা ডাঃ রঘুনাথ কারনাড ছিলেন বোম্বে মেডিকেল সার্ভিসের ডাক্তার। তাঁর বাবা মহারাষ্ট্র থেকে কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে গিয়ে বসবাস করা শুরু করেন যখন তাঁর বয়েস ছিল মাত্র চোদ্দ। মহারাষ্ট্রে থাকাকালীনই তাঁর নাটকের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। ১৯৫৮ সালে তিনি কর্ণাটক আর্টস কলেজ থেকে অঙ্ক ও স্ট্যাটিসটিক নিয়ে গ্রাজুয়েট হন। এরপর ইংল্যান্ডের ম্যাগডালেনে অবস্থিত অক্সফোর্ডের থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৬০-৬৩)। অক্সফোর্ডে পড়াকালীন তিনি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সভাপতি পদে নির্বাচিত (১৯৬২-৬৩) হন।

এরপর বর্তমান চেন্নাইয়ের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে

সাত বছর (১৯৬৩-৭০) কাজ করার পর তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করে পুরোপুরি লেখালেখিতে নিয়োজিত হন। তিনি ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৮৮ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সঙ্গীত নাটক একাডেমীর চেয়ারম্যান। তিনি নেহরু সেন্সরের ডিরেক্টর পদেও আসীন ছিলেন। ২০০০-২০০৩ সালে তিনি লন্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনে কিছুদিন সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে ছিলেন।

গিরীশ কারনাড ছিলেন একজন নাট্যকার। তিনি তাঁর নাটকগুলি লিখতেন কানাড়া ভাষায়। সেগুলি পরে ইংরেজি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ভাষান্তর করা হতো। কারনাড কানাড়া ছবি সনস্কারা (১৯৭০)-তে প্রথম নিজে অভিনয় এবং চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম পরিচালনা করা ছবি 'ধামসা বৃক্ষ' (১৯৭১) তাঁকে সেরা পরিচালকের পুরস্কার এনে দিয়েছিল। এই ছবিটি কানাড়ি ভাষায় সেরা ফিচার ফিল্মেরও পুরস্কার পেয়েছিল। এই ছবিটি রাষ্ট্রপতির গোল্ডেন লোটাস পুরস্কার পায়।

তিনি ধর্মীয় মৌলবাদী হিন্দুত্ববাদীদের সমালোচক ছিলেন। ১৯৯২ সালে যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয় হিন্দুত্ববাদীরা তখন তিনি এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সবসময় কাজ করে গেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে আরএসএস, বিজেপি এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের বিরোধিতা করেছেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে নরেন্দ্র মোদির নামের বিরোধিতা করেছিলেন।

গিরীশ কারনাডের মৃত্যুতে চলচ্চিত্র ও নাট্য জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শোক প্রকাশ করেছেন। □

দিশাহীন জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট (২০১৯-২০)

সুমিত ভট্টাচার্য

গত ৫ জুলাই, দ্বিতীয় মোদী সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে ২০১৯-২০ সালের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন। ঠিক তার আগের দিন, নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা কে ভি সুব্রহ্মনিয়ম ২০১৮-১৯ সালের আর্থিক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। আর্থিক সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং কেন্দ্রীয় বাজেট দুটি পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়া। কারণ আর্থিক সমীক্ষা প্রতিবেদনে বিগত আর্থিক বছরে (এক্ষেত্রে ২০১৮-১৯) দেশীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্য সম্পর্কে যেমন মূল্যায়ণ করা হয়, তেমনি স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করে, সেগুলির নিরাময়ের প্রয়োজনে কিছু দাওয়াই ব্যবহার করার পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য থাকে কেন্দ্রীয় সরকার যতে চিহ্নিত রোগগুলি নিরাময়ের জন্য সুপারিশকৃত দাওয়াইগুলির সংস্থান বাজেটে রাখে। বলাবাহুল্য বাজেটের মতই, আর্থিক সমীক্ষা প্রতিবেদনেও শাসক শ্রেণীর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়।

কে ভি সুব্রহ্মনিয়ম তাঁর প্রতিবেদনের শুরুতেই বলেছেন যে, তিনি আর্থিক বৃদ্ধির এক নয়া সড়ক নির্মাণ করতে চান যা এযাবৎকাল অনুসৃত সনাতন ভাবনার থেকে অনেকটাই পৃথক। তাঁর মতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি চাহিদা ও আর্থিক বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি নির্ভর করে বিনিয়োগের ওপর। প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে ২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছিল এবং এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে রবি শস্যের উৎপাদন একর পিছু কম হওয়া এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা। যদিও ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা প্রকাশ করে, কেন্দ্রীয় সরকারকে বিনিয়োগ ও রপ্তানি নির্ভর বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে এসেছে চীনের অর্থনীতির কথা। বিশেষত রপ্তানির ক্ষেত্রে সাহসী পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে, পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোরকম দোদুল্যমানতা বা অনিশ্চয়তা পরিহার করার কথা বলা হয়েছে আর্থিক সমীক্ষায়। এমনকি পরিকল্পনা গ্রহণের গুণমান বজায় রাখার জন্য, সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে একটি ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা অনিশ্চয়তা পরিমাপক সূচক গঠনের সুপারিশও করা হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সরকারী স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণের গুণমান যাচাই করার কথাও বলা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও আর্থিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য শ্রম আইন সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন ক্ষুদ্র উদ্যোগকে রক্ষা করার পরিবর্তে বৃদ্ধির স্বার্থে নবীন সংস্থাকে রক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় সুদের হার কমানোর সুপারিশও করা হয়েছে। ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে আর্থিক সমীক্ষায় সুপারিশ করা হয়েছে চারটি ক্যাটাগরি তৈরী করার যেমন অদক্ষ, আধা-দক্ষ, দক্ষ এবং বিশেষ দক্ষ। একই সাথে এই সমীক্ষায় শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। এক কথায় দেশী-বিদেশী বেসরকারী পুঁজিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথাই শ্রী সুব্রহ্মনিয়ম তাঁর আর্থিক সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলেছেন।

আর্থিক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পরের দিন, অর্থাৎ ৫ জুলাই সংসদে বাজেট পেশ করেছেন দেশের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য হল, বাজেট ৫ বছরের জন্য তৈরি করা হলেও এর মধ্যে আগামী ১০ বছরের স্বপ্ন লুকিয়ে রয়েছে। স্বপ্নটি হল ভারতীয় অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করা। এই লক্ষ্যেই নাকি আগামী পাঁচ বছরের জন্য গ্রাম ভারত, নগর ভারত, যুব ও মহিলা, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন, প্রযুক্তিগত উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে বাজেটে এমন লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েয়ে যা যুক্তিপূর্ণ এবং পূরণ করা সম্ভব। তিনি আরও বলেছেন, বিলগ্নীকরণ, কর ও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন অতিশয়োক্তির পথে হাঁটা হয়নি। নন ব্যাঙ্কিং ফাইনান্সিয়াল কোম্পানী এবং হাউজিং ফাইনান্স কোম্পানীগুলির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। নতুন করে যাঁরা ব্যবসা শুরু করতে চান, তাঁদের বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হবে বলেও অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। তাঁর আরও বক্তব্য হল, সমাজের দরিদ্র অংশ, তপশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য বাজেটে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ ও অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দের প্রশ্নেও নাকি কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। অর্থমন্ত্রী অপ্রচলিত শক্তি উৎসের ওপর জোর দেওয়া এবং বায়ুদূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেছেন। সর্বোপরি দেশীয় অর্থনীতির শ্লথতা দূরীকরণের জন্য, চালু অর্থবর্ষে ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকার বিলগ্নীকরণের প্রস্তাবও বাজেটে রাখা হয়েছে।

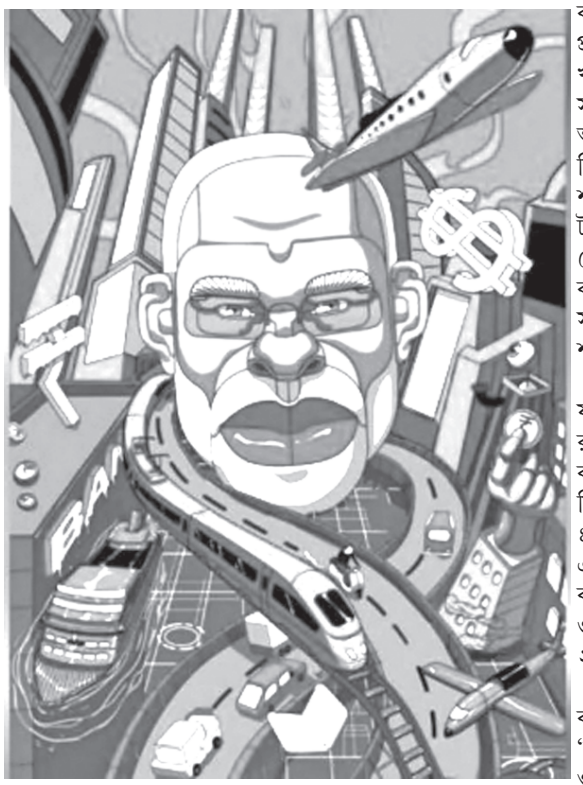

(দুই)

এককথায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ের বাজেট বক্তৃতায় এমন একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন, যাতে মনে হয় গত পাঁচ বছরে দেশীয় অর্থনীতিতে তেমন কোন বড় সমস্যা ছিল না। সমস্যা বা যেটুকু ঘাটতি এদিক ওদিক ছিল, সেই অনুযায়ী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই, দেশীয় অর্থনীতি টগবগ করে ছুটতে শুরু করবে। তাই তাঁর বাজেট বক্তৃতা শুনলে বা পড়লে মনে হবে, মোদী সরকারের প্রথম পাঁচ বছরের সাফল্যগুলিকে আরও প্রসারিত করাই তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তা সত্যিই কি বাজেট বরাদ্দের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে? ২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র মোদী প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন, তখন ভারতীয় অর্থনীতি ছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি ডলারের অর্থনীতি। গত পাঁচ বছরে তার আকার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি ডলার। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন হল, যা অর্থমন্ত্রী বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলা। বর্তমান ৫ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির হার ধরলে, এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আগামী পাঁচ বছর গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার হতে হবে ৮ শতাংশের বেশী। অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধির এই হার ধরে রাখতে হলে, বিনিয়োগের মাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিনিয়োগের প্রশ্নে সরকারের ভূমিকা কি হবে তা অর্থমন্ত্রী খুলে না বললেও তাঁর বাজেট বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেই বোঝা যায়। সরকারেরর খুব বেশী বিনিয়োগ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের আকাঙ্খা রয়েছে। তাই বেসরকারী বিনিয়োগকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ দান করা ছাড়া সরকারের আর কোন গতি নেই। তাই বেসরকারী বিনিয়োগ বিপুল মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে ধরে নিয়ে তার সুফলকে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে বাজেটে বাগাড়ম্বর থাকলেও, বরাদ্দের প্রশ্নে সেই সদিচ্ছার প্রতিফলন নেই। ২০১৭-২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বমোট ব্যয় ছিল, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ১২.৭ শতাংশ, ২০১৮-১৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩.২ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ সালে বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী তা হবে ১৩.১ শতাংশ । অর্থাৎ 'বৃদ্ধি'কে গতিশীল করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের কোন প্রস্তাব বাজেটে নেই।

ব্যয় বৃদ্ধি না পাওয়ার অর্থ হল বরাদ্দ বৃদ্ধি না পাওয়া। গুরুত্বপূর্ণ ৬টি সামাজিক প্রকল্পের প্রস্তাবিত বরাদ্দের দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি ধরা যায়। যেমন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ২০১৮-১৯ সালে সংশোদিত বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮৪,৩৬১ কোটি টাকা যা ২০১৯-২০ সালে বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী হ্রাস পেয়ে হবে ৮১,৮৬৩ কোটি টাকা। তিন শতাংশ বরাদ্দ হ্রাস ও মুদ্রাস্ফীতিকে একযোগে ধরলে, প্রকৃত প্রস্তাবে বরাদ্দ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কেও। ২০১৮-১৯ সালে এই প্রকল্পে খরচ করা হয়েছিল ৬১,০৮৪ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ সালে বাজেট বরাদ্দ হল ৬০,০০০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার ক্ষেত্রেও ২০১৮-১৯ সালে বাজেট বরাদ্দ ও ২০১৯-২০ বাজেট বরাদ্দের কোন পার্থক্য নেই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রকৃত পক্ষে হ্রাস করা হয়েছে। শুধুমাত্র কৃষকদের আয় সহায়ক প্রকল্পে (যা নির্বাচনের কিছুদিন আগে চালু করা হয়েছিল) বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ হ্রাস করে, শুধুমাত্র একটি প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার অর্থ হল, কার্যত স্থায়ী ও সার্বিক উন্নয়নের গতি শ্লথ হওয়া।

আরও মজার বিষয় হলো, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে, শুধু তাই নয়। এই হ্রাসপ্রাপ্ত বরাদ্দের অর্থ কোন্ কোন্ উৎস থেকে ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, তাও অর্থমন্ত্রী খোলাখুলি বলতে পারেননি। কারণ আর্থিক ঘাটতিকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে তাঁর সরকার বা মোদী সরকার দায়বদ্ধ। যেমন ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩.৩ শতাংশ। তবে একটি নতুন উৎস থেকে আয় বৃদ্ধির কথা বাজেটে বলা হয়েছে। তা হলো, অতি ধনীদের প্রদেয় আয় করের হার বৃদ্ধি করা এবং প্রদত্ত করের ওপর অতিরিক্ত সারচার্জ বসানো। মূলত, ২.৫ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত যাদের বাৎসরিক আয় তাদের ক্ষেত্রে এবং ৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে যাদের বাৎসরিক আয় তাদের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন হারে আয়কর বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী করার সুযোগ খুবই সীমিত, কারণ ২০১৭-১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী, যাঁরা আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৯৯ শতাংশেরই আয় বছরে ২ কোটি টাকা বা তার কম। বছরে ৫ কোটি টাকা বার তার বেশি আয় করেন, এমন আয়কর দাতার সংখ্যা মোট আয়কর দাতার .০৫ শতাংশ মাত্র।

আবার এই সূত্র থেকে যতটুকু আয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে, তাকে খেয়ে নেবে কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাস করার সিদ্ধান্ত। বছরে ২৫০ কোটি থেকে ৪০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করে এমন কর্পোরেশনের প্রদেয় কর্পোরেট করের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী কর্পোরেট কর হ্রাস করলেও, সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য 'জ্বালানী পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর লিটার পিছু এক টাকা করে শুল্ক বৃদ্ধি করেছেন। ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। এই সময় অর্থমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের ওপর নতুন করে মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপাবে। সর্বোপরি বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণের পরিচিত পথে, বর্তমান অর্থবর্ষে ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা আয় করা যাবে বলে ধরা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে এই পথে সরকার আয় করেছিল ৮০ হাজার কোটি টাকা।

(তিন)

এবারের বাজেটের সব থেকে বিস্ময়কর দিক হলো, দ্বিতীয়বারের জন্য বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করলেও, কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্কট, বেকারি বা ভারতের রপ্তানিকৃত পণ্যের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত ভারতীয় অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, সে সম্পর্কে বাজেটে কোনো কথা নেই। এমনকি জিএসটি-র মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ যে গত বছরের বাজেটের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার থেকেও ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা কম হয়েছে, সে সম্পর্কে কারণ অনুসন্ধান বা সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো কথা কেন্দ্রীয় বাজেটে নেই। অথচ আশা ব্যক্ত করা হয়েছে, ২০১৯-২০ সালে জিএসটির মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষে নতুন কোনো সূত্র, কোনো উপায় উদ্ভাবন বা পরিকল্পনা গ্রহণের কোনো উদ্যোগ এবারের বাজেটে নেই। অথচ তার সুযোগ কিন্তু ছিল। উচ্চ আয় সম্পন্ন (বছরে ৫ কোটি টাকা বা তার বেশি) ব্যক্তিদের ওপর আয়করের হার বৃদ্ধি করার বাগাড়ম্বর না করে (যেহেতু এই অংশটি মোট আয়কর দাতার .০৫ শতাংশ মাত্র), আমাদের দেশের যাঁরা 'বিলিওনিয়া'র (যে সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে) তাঁদের কাছ থেকে 'সম্পদ কর' এবং 'উত্তরাধিকার কর' আদায় করার সুযোগ ছিল। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের বিলিওনিয়ারদের মোট সম্পদের আর্থিক মূল্য ৫৬০ লক্ষ কোটি টাকার মতো। মাত্র ১ শতাংশ হারে সম্পদক কর সংগ্রহ করলেই ৫.৬ লক্ষ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা পড়তো। এর সাথে উত্তরাধিকার করকে যুক্ত করলে বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান সরকার করতে পারত, যার সাহায্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো। কিন্তু তা না করে দ্বিতীয় মোদী সরকার নয়া উদারবাদের প্রেসক্রিমশন অনুযায়ী বিলগ্নিকরণ, বেসরকারীকরণ ও বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে (কেন ও কিভাবে তা বলা হয়নি) এমন প্রত্যাশা করে বাজেট তৈরি করেছে।

এই বাজেটের আরো দুটি ক্ষতিকারক প্রস্তাব সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমটি হলো, সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কোনো সরকার এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে। প্রশ্ন হলো, সরকার অভ্যন্তরীণ বাজারের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে ঝুঁকলো কেন? আসলে নিজেদেরই স্থির করা আর্থিক ঘাটতির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখার জন্যই সরকার অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ঋণ গ্রহণে অপারগ। কিন্তু পরিবর্তে যে পথ গ্রহণ করা হচ্ছে, তাতে দেশের অর্থনীতির ওপর আন্তর্জাতিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাবে এবং ঋণ পরিশোধে কোনো কারণে বিলম্ব হলে, ব্যয় সঙ্কোচের ভয়ঙ্কর শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেমনটা ঘটেছিল গ্রীসের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলা। জি এস টি চালু করার ফলে এমনিতেই রাজ্যগুলির রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়েছে। জিএসটি-র সংগ্রহ হ্রাস পেলে রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়াও এবারের বাজেটে 'সেস' ও 'সারচার্জ' বসিয়ে অতিরিক্ত আয়ের যে সংস্থান অর্থমন্ত্রী করতে চেয়েছেন, তার অংশ রাজ্যগুলি পাবে না। এক কথায় রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়ে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে রাজ্যকে দুর্বল করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যগুলি সাহায্যের জন্য কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে তাকে ব্যবহার করবে।

'সকাল দেখলেই বোঝা যায় দিনটি কেমন যাবে'—এই প্রবাদ অনুযায়ী দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম বাজেট থেকে বোঝাই যাচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় একই চলার পথ গ্রহণ করেছে মোদী সরকার। ফলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনও রয়ে গেছে একইরকম। □

বিজ্ঞপ্তি

২০১৯-২০ বর্ষে সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত জানানোর জন্য জেলা ও অঞ্চল কমিটিগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভ্রম সংশোধন

গত এপ্রিল- মে ২০১৯ সংখ্যায় শহীদ মিনারে মে দিবস কর্মসূচীর রিপোর্টিংয়ে ১২ই জুলাই কমিটির বক্তা হিসেবে সমীর ভট্টাচার্যের পরিবর্তে তপন দাশগুপ্তের নাম ছাপা হয়েছে। এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির মোকাবিলায় গণআন্দোলনই একমাত্র পথ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত। নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত বিজেপি জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হয়েছে। এই নির্বাচনী ফলাফল বেশ কিছুটা অপ্রত্যাশিত, এমনকি শাসকদলের কাছেও। বলাই বাহুল্য এই ফলের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থা আরও সংহত রূপ পাবে। বিজেপি ও তার নির্বাচনী জোট ২০১৪ সালের তুলনায় অর্থাৎ পূর্ববর্তী লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় অধিক পরিমাণ ভোট এবং আসনের অধিকারী হয়েছে। ২০১৪ সালে বিজেপি জোটের ভোটের পরিমাণ ছিল ৩৭.৩ শতাংশ, এবারে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৩.৮১ শতাংশ। আসনের সংখ্যা ২০১৪ সালে ছিল ৩০৩টি, যা এবারে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৫৩টি আসন। বিজেপি ২০১৪ সালে এককভাবে ভোট এবং আসন পেয়েছিল যথাক্রমে ৩১ শতাংশ ভোট ও ২৮২টি আসন। এবারে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৭.৪ শতাংশ ভোট এবং ৩০৩টি আসন। মাত্র তিনটি রাজ্যে যেমন তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরালায় বিজেপি ও তার জোট একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু অন্য সব রাজ্যেই বিশেষত হিন্দী বলয়ের রাজ্যগুলিতে তাদের সাফল্য বিপুল। অন্যদিকে দেশের শাসকশ্রেণীর অপর দল কংগ্রেসের অবস্থা শোচনীয়। গত নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ৪৪টি থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫২টি আসন লাভ করলেও প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ প্রায় এক জায়গাতেই অর্থাৎ বিশ শতাংশে রয়ে গেছে। ১৭টি রাজ্যে এই দল একটি আসনেও জয়ী হতে পারেনি। এমনকি হিন্দী বলয়ের যে তিনটি রাজ্যে (রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়) কয়েকমাস আগে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল, সেই তিনটি রাজ্যেও সিংহভাগ আসন দখল করেছে বি জে পি। একটি বা দুটি করে আসন পেয়েছে কংগ্রেস দল। এই নির্বাচনে বামপন্থীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। বামপন্থীদের তিনটি শক্তিশালী ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং ত্রিপুরা সর্বত্রই একই চিত্র। কেরালায় একটি এবং তামিলনাড়ুতে বিরোধী দল ডি.এম.কে-র সাথে জোট গড়ায় চারটি (সিপিআই ও সিপিআই(এম) দুটি করে) আসন লাভ করায় মোট ৫টি আসন তারা পেয়েছে। এরাজ্যে বামপন্থীরা শুধু যে পরাজিত হয়েছে তা নয়, একটি বাদে বাকি সব আসনেই বামপ্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ত্রিপুরাতে একই চিত্র। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা বাদে অন্যত্র আঞ্চলিক দলগুলি এই নির্বাচনে ব্যাপক ধাক্কা খেয়েছে, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে এটি বেশ স্পষ্ট।

এক

নির্বাচনী ফলাফলে বি জে পি-র জয়ের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আলোচনার দাবী রাখে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে বি জে পি-র সর্বভারতীয় স্তরে প্রাপ্ত ভোটের হার ৩৭.৪ শতাংশ। কিন্তু জয়ী হওয়া ৩০৩টি আসনের মধ্যে অন্তত ২০০টি কেন্দ্র রয়েছে যেখানে বিজেপি ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে। গুজরাটের ২৬টি কেন্দ্রের সব কটিতেই, মধ্যপ্রদেশের ২৫টি কেন্দ্রে, রাজস্থানের ২৩টি কেন্দ্রে, কর্ণাটকের ২০টি কেন্দ্রে, দিল্লীর ৭টি কেন্দ্রে, হরিয়ানার ১০টির মধ্যে ৯টি কেন্দ্রে, বি জে পি ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে।

গত বছরের শেষের দিকে যে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার তিনটিতে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল, কিন্তু সেই বিধানসভা নির্বাচনে সব কটিতেই বিজেপি পরাস্ত হয়। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে তিনটি রাজ্যেই বিজেপি বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। যেমন মধ্যপ্রদেশে ২৯টি আসনের ২৮টিতে, ছত্তিশগড়ে ১১টি আসনের ৯টিতে, রাজস্থানে ২৫টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসনে এবং কর্ণাটকে যেখানে রাজ্য সরকারে কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট ক্ষমতাসীন, সেখানেও ২৮টি আসনের

২৫টিতে বিজেপি জয়ী হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে এস পি-বি এস পি জোট হওয়া সত্ত্বেও ৮০টি আসনের মধ্যে ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। বিহারে বিজেপি-জেডি(এস) ও রামবিলাস পাশোয়ানের এল জি পি জোট ৪০টি আসনের মধ্যে ৩৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলির পাশাপাশি অন্যত্রও বিজেপির সাফল্য রয়েছে। বিশেষত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে, এই সাফল্যের চিত্র স্পষ্ট।

বি জে পি জোটের এই সাফল্যের অনেকগুলি কারণ এবং তার ফলাফলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথমত সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ভাষ্যের (ন্যারেটিভ) প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের শেষের দিকে হিন্দী বলয়ের তিনটি রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল থেকে বি জে পি-আর এস এস শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। এই তিন রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের সাফল্যের বিবরণ। সাম্প্রদায়িকতার ইস্যুও প্রচারে ছিল, কিন্তু তা ব্যাপক ছিল না। নির্বাচনী ফলাফলে বিজেপি পরাস্ত হওয়ার পর তারা তাদের নির্বাচনী ভাষ্যের ধারায় পরিবর্তন আনে। তাদের ধারণা হয় যে সরকারী সাফল্য এত বিশাল নয় যে, তার দ্বারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব। ফলে তারা নতুন নির্বাচনী ভাষ্যর অনুসন্ধান করতে থাকে। ঠিক এইরকম একটা সময়েই কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জাতীয় সড়কের উপর সি আর পি এফ জওয়ান ভর্তি ট্রাকে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ কিছু সংখ্যক জওয়ান নিহত হয়। এরপরই বালাকোটে সার্জিকাল স্ট্রাইকের ঘটনা ঘটে। এই উভয় বিষয়কে কেন্দ্র করে বি জে পি-আর এস এস এবং তাদের পরিচালিত প্রচার মাধ্যমগুলির পক্ষ থেকে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক উগ্র জাতীয়তাবাদী যুদ্ধোন্মাদনার পরিবেশ পরিকল্পিত ভাবে তৈরী করা হয়। একই সাথে এই যুদ্ধোন্মাদনার পরিবেশে বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদিকে 'অতিমানব' হিসাবে দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে হাজির করা হয়। প্রচার করা হয় যে সন্ত্রাসবাদকে দমনের জন্য আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে একমাত্র নরেন্দ্র মোদিই উপযুক্ত ব্যক্তি। এই নির্বাচনী ভাষ্য নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজেপিকে ব্যাপক সুবিধা দেয়।

অবশ্য বিজেপি-র এই প্রচার তথ্য ভিত্তিক নয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে অর্থাৎ প্রাক্ নরেন্দ্র মোদি সরকারের শাসনকালে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা ছিল ১০৯টি, কিন্তু মোদি সরকারের শাসনে অর্থাৎ ২০১৪-১৯ সালে এই আক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬২৬টি। নিরাপত্তাকর্মী নিহত হওয়ার সংখ্যা এই সময়কালে ১৩৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮৩ হয়েছে। অসামরিক ব্যক্তি নিহতের সংখ্যা ১২ থেকে বৃদ্ধি ২১০টি এবং সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ৫৬৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫৯৬টি হয়েছে। এইসব তথ্য প্রমাণ করে যে, সন্ত্রাস দমন করা দূরের কথা নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ নির্বাচনী ভাষ্যে প্রচারের ধারাটি ছিল ঠিক এর বিপরীত। আর এই ধরনের অসত্য প্রচারে জীবন জীবিকার সমস্যাবলী বিশেষত বেকারী, দারিদ্র, কর্মচুতি, আয় ও সম্পদের বৈষম্য কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া প্রভৃতি বিষয় পিছনে চলে গেছে বা গৌণ হয়ে পড়েছিল।

এছাড়াও সন্ত্রাসবাদের বিরোধীতার প্রশ্নে তীব্র পাক বিরোধী বিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে। একই সাথে এই সন্ত্রাসবাদকে এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে, যাতে মানুষের মনে এই ধারণা তৈরী হয় যে 'হিন্দু' ভারত আজ পাকিস্তানের দ্বারা আক্রান্ত। এই আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি। পরবর্তীকালে বালাকোটের সার্জিকাল স্ট্রাইক এই ঘটনায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে।

বিগত পাঁচ বছর ধরে দেশব্যাপী আর.এস.এস-বিজেপির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের যে প্রক্রিয়া চলানো হয়েছে, নির্বাচনী প্রচার ও তার ফলাফলের মধ্য দিয়ে আরও সংহত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকারকে ব্যবহার করে আর এস এস বিভিন্ন স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেমন সি বি আই, আর বি আই, সি ভি সি, সি আই টি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে দখল করে এই সংহতিকরণ প্রক্রিয়াকে তীব্র করেছে।

সমগ্র নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি হিন্দুত্বকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে। বিভিন্ন জাত পাত-এর প্রভাবকে এক সূত্রে বেঁধে সকলকেই হিন্দুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। অর্থাৎ দলিত, আদিবাসী অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের একটিই পরিচয় 'হিন্দু' বলে নির্দিষ্ট করেছে। এর ফলে আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায় বা ও বি সিদের ব্যাপকভাবে বিজেপি তার পাশে পেয়েছে। সেন্টার ফর স্টাডিজ অব ডেভেলপিং সোসাইটির (সি এস ডি-র), ভোট পরবর্তী জনমত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সর্বভারতীয় স্তরে দলিতদের ৪৬ শতাংশ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৪৯ শতাংশ এবং ও বি সি দের ৫৮ শতাংশ ভোট বিজেপি লাভ করেছে। সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মধ্য দিয়েই এটি সম্ভব হয়েছে।

নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পিছনে রয়েছে অর্থ বল। প্রতিটি কর্পোরেট হাউস বিভিন্ন ভাবে বিজেপিকে সাহায্য করেছে। সেন্টার ফর মিডিয়া ইন্ড্রাস্টিজ-এর এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বিজেপি নির্বাচনে ২৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এই পরিমাণ হলো সমগ্র নির্বাচনী ব্যয়ের ৪৫ শতাংশ। নির্বাচনী বণ্ডের মধ্য দিয়ে বিপুল অর্থ বিজেপি-র নির্বাচনী তহবিলে জমা পড়েছে।

বি জে পি বিগত তিন বছর ধরে আর এস এসের সাংগঠনিক শক্তিকে ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বুথগুলি বা প্রার্থীদের সম্পর্কে গভীরভাবে সমীক্ষা করে তারা তাদের বিকল্প নির্বাচনী ভাষ্যকে নির্মাণ করেছে। এই ভাষ্যকে এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবন-জীবিকার জ্বলন্ত ইস্যুগুলিকে ভোটদানের সময় ভুলে গেছে।

বিজেপি এই নির্বাচনে ব্যপকভাবে দেশের শাসকশ্রেণীর বিশেষত বৃহৎ পুঁজির সমর্থন লাভ করেছে। এর প্রধান কারণ হল বিগত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদি সরকারের শাসনে যে 'ধান্দার ধনতন্ত্র' চালু হয়েছে তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে আম্বানি গোষ্ঠীর সম্পত্তির পরিমাণ ২৩০০ কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫০০০ কোটি ডলার হয়েছে। আম্বানি তার ৫৮ বছরের জীবনে যে পরিমাণ সম্পত্তি করেছে, মোদি সরকারের আমলে সম্পত্তি করেছে তার থেকে অনেক বেশি প্রায় একই চিত্র গৌতম আদানি। গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে তবে আম্বানী গোষ্ঠীর সম্পত্তির পরিমাণ পাঁচ হাজার শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সালের আদানীদের সম্পত্তি ২৬০ কোটি ডলার থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১৯০ কোটি ডলার। একই সময়ে রামদেবের পতঞ্জলি সংস্থা ক্ষুদ্র সংস্থা থেকে বৃহত্তর সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ২০১৪ সালে তার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি ডলার, ২০১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬০০ কোটি ডলার। দেশের বিশজন ধনী ব্যক্তির অন্যতম হলেন রামদেব। বৃহৎ কর্পোরেট হাউসের এই ফুলে ফেঁপে ওঠা অবস্থাই ছিল বি জে পির নির্বাচনী তহবিলের প্রধান উৎস। এদের কাছ থেকে পাওয়া বিপুল অর্থের সাহায্যে বি জে পি তার বিপুল প্রচার সম্ভারের আয়োজন করেছিল। শিল্পপতিদের দেওয়া অর্থেই বিজেপির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল এবং ব্যবস্থা হয়েছিল 'পেইড নিউজে'র। বেআইনীভাবে চালু করা হয়েছিল 'নমো টিভি,' যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তি নির্মাণ। নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করে এই টিভি সম্প্রচারিত হলেও এই প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন ছিল নীরব।

বি জে পি-র বিকল্প নির্বাচনী ভাষ্য প্রচার এবং নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তি নির্মাণ সম্পর্কে নীরব থেকে নির্বাচন কমিশন নিজেই বিধিভঙ্গ করেছে। বিরোধীদের বার বার আপত্তি সত্ত্বেও, নির্বাচন কমিশন ছিল অদ্ভুত ধরনের নীরব। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভারতীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। এই পরিস্থিতিতে কলেজিয়ামের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নিয়োগের দাবীটি সংগত কারণেই জোরালো হয়ে উঠছে।

দুই

বি জে পি-র বিপুল জয়ের পিছনে জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছন্নছাড়া অবস্থান অনেকটাই দায়ী। বি জে পি - আর এস এস - এর আগ্রাসী হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে নিয়ে কোনও বিশেষ ভূমিকা প্রতিপালন করতে পারেনি। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস বিরোধীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন করে নির্বাচনে লড়াই করার পরিবর্তে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পরিণতিতে রায়বেরিলি ছাড়া উত্তরপ্রদেশের সবকটি আসনেই কংগ্রেস দল পরাজিত হয়, এমনকি কংগ্রেসের ঘাঁটি বলে পরিচিত আমেথি থেকে স্বয়ং রাহুল গান্ধী পর্যন্ত পরাজিত হন। সদ্যজয়ী তিন রাজ্য ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনও উদ্যোগ কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। হরিয়ানা এবং দিল্লীতেও কংগ্রেস দল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ভারতীয় জনগণ বি জে পি - র বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীদের দেখতে পায়নি।

▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রাম-আন্দোলন-চেতনায় উদ্দীপ্ত হোক উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী
যুগ্ম-সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আগামী ২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে দেশি-বিদেশী পুঁজিপতি ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমের যৌথ প্রচেষ্টায় বিভ্রান্তি কর প্রচার চালিয়ে বামপন্থীদের অপ্রাসঙ্গিক করে তোলার অপচেষ্টা জারি আছে। একদিকে সংস্কারের নামে সাধারণ জনজীবনের ওপর তীব্র আক্রমণ, অপরদিকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি, বিভিন্ন স্বাধীন ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশের ঐক্য-সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে সংগঠন পরিচালনার অভিমুখ নির্ধারণ করাই হবে সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। ট্রেড ইউনিয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা। কিন্তু পরিস্থিতির ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এই শাশ্বত ধারণায় ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

বিশ্বজোড়া আর্থিক সঙ্কটের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, যে সঙ্কট ২০০৮ সাল থেকে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে চলেছে। আর্থিক সংস্কারের ঢেউ আর তার সাথে ধেয়ে আসা তীব্র বেকারীর আবহে দক্ষিণপন্থার উত্থান ঘটছে। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বামপন্থীদের সরকার ছিল, বিশ্বের অপর প্রান্তে বামপন্থার পুনর্জাগরণের আশার আলো দেখা গিয়েছিল। অথচ সেই ভূখণ্ডেই একের পর এক দক্ষিণপন্থী সরকার গঠিত হচ্ছে। বৃটেনসহ ইউরোপের অনেক দেশেই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে মূলধারার দলগুলিকে পেছনে ফেলে দিয়ে নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে কট্টর দক্ষিণপন্থী দলগুলো। উদারবাদী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে সরকার চালালেও সেই সঙ্কটকে তারা অস্বীকার করছে। মানুষের বেকারত্বের জ্বালাকে স্বীকার করে তার উৎসে থাকা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দায়ী না করে, ভিনদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের আগমনই সঙ্কটের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছে। সব মিলিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যেখানে উদারবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্কটের অস্তিত্বই অস্বীকার করার সুযোগ নিয়ে আর্থিক সঙ্কট ও বেকারির সমস্যাকে স্বীকার করে নিয়ে অভিবাসন বিরোধী এ্যাজেন্ডাকে ভর করে উগ্রদক্ষিণপন্থী শক্তির বাড়বাড়ন্ত।

বিশ্বজুড়ে সংকটমুক্তির সাময়িক লক্ষ্যে হয় দক্ষিণপন্থার উত্থান, স্বৈরতন্ত্রী জনমোহিনী তত্ত্বের বিস্তার যে সঙ্কটের সমাধান করতে পারছে না, যার দুনিয়াজোড়া চিহ্নগুলিতে স্পষ্ট। তা সে মার্কিন দেশের ডোনাল্ড ট্রাম্পই হোক বা অন্যান্য স্বৈরতন্ত্রী জনমোহিনীতত্ত্বের প্রভাবাধীন দেশগুলিই হোক।

আমাদের দেশেও নব্য উদারনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ-বিক্ষোভ হতাশার সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রবেশ করেছে। নয়া উদারবাদী অর্থনীতি প্রতিটি মানুষের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম—এমন মোহজাল তৈরি করা হয়েছিল। সেই পথ ধরেই 'উন্নয়ন' এ্যাজেন্ডাকে হাতিয়ার করে দেশীয় বুর্জোয়া দলগুলি বারে বারে শাসন ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরে সংস্কারবাদী পথ অবলম্বন করে মানুষের জীবন-যন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলেছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে কেন্দ্রে এন ডি এ সরকার প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে জনজীবনে যন্ত্রণার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঁচ বছর পূর্বে নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলন, বছরে দু কোটি বেকারের চাকরি দেয়া হবে। কিন্তু পাঁচ বছরে দশ কোটি বেকারের চাকরি হওয়া তো দূরের কথা, যারা কোনোমতে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন, 'নোটবন্দী' আর পরিকল্পনাহীনভাবে জি এস টি চালু করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিগত দু'বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের চাকরি চলে গেছে। এন এস এস ও-র সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেকারির হার দাঁড়িয়েছিল ৬.৪ শতাংশ যা বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। নয়া উদারনীতির বেপরোয়া প্রয়োগে সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে কৃষিক্ষেত্র। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ষাট ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে কৃষিক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল, সে ক্ষেত্রের সঙ্কট বেড়েছে। আরো বেশি অভাব ও দুর্দশায় পড়েছেন আমাদের অন্নদাতা কৃষক সমাজ।

গত পাঁচ বছর ধরে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ তাদের ক্ষোভকে চেপে রেখেছিলেন তা নয়। বিভিন্ন সময়ে মেহনতী মানুষের আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। নাসিক থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ৫০ হাজার কৃষকের লং মার্চ, দিল্লীর বুকে মজদুর-কিষাণ সংঘর্ষ র‍্যালি এবং ৮-৯ জানুয়ারি ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী সর্বভারতীয় ধর্মঘটে ২০ কোটি শ্রমজীবী জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ঘটেছে। এই ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলনের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিত কয়েকটি উপনির্বাচন ও তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে। ঐ নির্বাচনগুলিকে নরেন্দ্র মোদীর দলকে পরাজিত হতে হয়েছে। 'উন্নয়ন' বা 'বিকাশ'-এর প্রতিশ্রুতি গত পাঁচ বছরে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবারের নির্বাচনে জাতীয় নিরাপত্তা এবং 'উগ্র হিন্দুত্ব'-এর প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেওয়ার এজেন্ডাকে ব্যবহার করে কর্পোরেট পুঁজি এবং প্রচার মাধ্যমের যৌথ মেলবন্ধনে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে।

তবে কি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামক উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনটির রাজনৈতিক শাখা বিজেপি তাদের অভীষ্ট হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের সংবিধান এবং সংসদীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে পারবে? কতটাই বা সফল হতে পারবে? ভারতের মতো বিশাল দেশে তীব্র ও গভীর কৃষ্টি সঙ্কট, বেকারির সঙ্কট, শিল্প ও সামগ্রিকভাবে আর্থিক সঙ্কট যে ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে তা থেকে উত্তরণ ধান্দার ধনতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। উত্তর সত্যের মায়াজল থেকে বাস্তবে যে মুহূর্তে মানুষ ফিরবে, তার জীবন-জীবিকার প্রশ্নের মুখোমুখি হবে, মানুষ বুঝতে পারবে লগ্নিপুঁজির মদতপুষ্ট ধান্দার ধনতন্ত্র হিন্দুত্বের মোড়কে সঙ্কট মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তখনই প্রয়োজন হবে বামপন্থীদের, বামপন্থার। দ্বিতীয়বার বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পাশাপাশি দলিত ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ বাড়বে। সেটা ঠেকাতে পারে একমাত্র বামপন্থীরাই।

তীব্র মেরুকরণের পরিবেশের বাইরে থাকে নি এই রাজ্যও। রাজ্যে একটি একনায়কতন্ত্রী দলের স্বৈরচারী শাসন কায়েম হয়েছে। রাজ্যে শাসকদলের আট বছরের শাসনকালে অদ্ভুত আঁধার রাজ্যকে গ্রাস করেছে। রাজ্যে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার, জীবন-জীবিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আক্রান্ত অর্থশক্তি ও পেশিশক্তি সমগ্র রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে। শাসকদল ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা রাজ্যকে গ্রাস করেছে। শাসকদলের তাণ্ডব বাহিনীর হাতে শুধু বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্যরাই নয়, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আক্রান্ত। আক্রান্ত কর্মচারী সমাজ। বেতন কমিশনের সময়সীমা ক্রমশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রাজ্যের কর্ণধাররা পরিকল্পিতভাবে যুব সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিজেপি এবং তৃণমূলের দ্বন্দ্ব কৌশলগত, নীতিগত নয়। উভয় শক্তি ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মূল উদ্দেশ্য বামপন্থীদের অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের জনগণ বিভ্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি বিভ্রান্ত হয়েছে কর্মচারী সমাজ। এর প্রতিফলন ঘটেছে নির্বাচনী ফলাফলে। রাজ্যের শাসকদলের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে মানুষ যখন বিকল্প খুঁজছেন, তখন সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি আসরে নেমে পড়েছিল। সাময়িক বিভ্রান্ত করা সম্ভব হলেও অভিজ্ঞতাই বড় শিক্ষক। রাজ্যের জনগণ নিজ অভিজ্ঞতায় বিভ্রান্তির মোহজাল থেকে ছিন্ন হয়ে প্রকৃত শত্রু কে বা মিত্র কে তা চিনতে পারবেন। তবে তা আপনা আপনি হবে না। এই চিহ্নিতকরণের প্রধান সহায়কের দায়িত্ব নিতে হবে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবাহী সংগঠনগুলিকে।

এইরকম একটি অস্থির ও বিভ্রান্তিকর পরিবেশে উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শুধু রাজনৈতিক পরিস্থিতিজনিত কারণে নয়, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশে গড়ে ওঠা কর্মচারী আর বর্তমান সরকারের আমলে প্রশাসনে প্রবেশ করা স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারী—এই উভয় প্রকারের কর্মচারীর মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা কর্মচারী সমাজ বহুমাত্রিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে এই সম্মেলনে উপস্থিত হবেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চাকরিতে প্রবেশ করার সুবাদে নানান সুযোগ সুবিধা বিশেষ করে পে-কমিশন, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি ইত্যাদি বহু আর্থিক ও অধিকারগত দাবি অর্জনের মধ্য দিয়ে দারুণভাবে উপকৃত হয়েছেন। আবার নবীন প্রজন্ম যাদের চাকরিগত নিরাপত্তা নেই, স্বল্প বেতনে চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে এই দুই প্রজন্মের কর্মচারীর ক্ষেত্রেই আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও পরিস্থিতিজনত চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রাম-আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা কমছে। উদারবাদী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য মধ্যবিত্তের মধ্যে ভোগবিলাসের আকাঙ্খা তীব্র করে সংগ্রাম বিমুখ করে তোলা। এর প্রভাব থেকে কর্মচারী সমাজ এমনকি নেতা-কর্মীরাও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছে না। পরিণতিতে সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্যে না থাকলে যে নিজের জীবন, পরিবার বা সমাজের স্থিতি রক্ষা করা যায় না, তা কর্মচারী সমাজের মননে সবসময় থাকছে না। এই সম্মেলন পথ দেখাবে শুধুমাত্র আর্থিক দাবি-দাওয়ার ঘেরাটোপে আবদ্ধ না থেকে ঘটমান বিভিন্ন ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তার বিশ্লেষণ এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও তাঁদের লড়াইয়ে সাথী হওয়ার সঙ্কল্প। অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন থেকে গৃহীত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর যথাযথ রূপায়ণ সেই পথে এগিয়ে যেতে সহাতা করবে। বিগত বছরগুলিতে নবান্ন অভিযান, সমস্তপ্রশাসনিক বাধাকে উপেক্ষা করে বিকাশভবন অভিযান, পে কমিশন ও মহার্ঘভাতার দাবিতে একাধিক মিছিল-সমাবেশ, দপ্তরে দপ্তরে টিফিনের সময় এমনকি সেই সময়কে অতিক্রম করে দু'ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভের সফল কর্মসূচী প্রমাণ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার ইতিহাস নির্মাণে সময়ের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও আজও অটুট আছে। রাজ্য কর্মচারীদের ভরসার অপর নাম রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রায় ছ'দশক আগে অর্জিত এই শিরোপা এখনও স্থানচ্যুত হয়নি। নবান্নে পে-কমিশন ও বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবি উত্থাপন করার অপরাধে (!) রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় শাস্তিমূলক বদলিকে উপেক্ষা করে ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিটি অধিকার ও দাবি অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সর্বোপরি সংগঠনের অভ্যন্তরের কাঠামোকে সচল রাখা—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের একমাত্র চ্যাম্পিয়ন সংগঠন তা বারে বারে প্রমাণিত। একটা নির্দিষ্ট সময়ে কর্মচারী বন্ধুদের মধ্যে যে সমস্ত দাবিগুলি বিশেষ চর্চার বিষয় হয়েছে, সহজাত দক্ষতায় সেগুলিকে নির্বাচন করে সংগঠনের দাবিসনদে তা যুক্ত করা হয়েছে। কর্মচারীর মানসিক স্তরে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাকে উপেক্ষা না করে, কর্মচারীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়ে মনে সাহসের সঞ্চার করে কর্মসূচীর 'ফর্ম'-এর বিকাশ ঘটানো হয়েছে। ধর্মঘটসহ চিরাচরিত কর্মসূচী তো ছিলই, উদ্ভাবনী ক্ষমতার ব্যবহার করে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন 'ফর্ম'। প্রশাসনিক আক্রমণ ও আর্থিক বঞ্চনার শিকার কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, সমানুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচার ও কর্মসূচীর ঘনত্ব। কর্মচারী স্বার্থ সম্পর্কে কার্যত মুক ও বধির একটি সরকারের কাছে বারে বারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কর্মচারীদের দাবিগুলিকে। ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে যে মুখ্যমন্ত্রী একসময় রাজ্য কো-অডিনেশন কমিটিকে ভাঙার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তিনিই এই সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ

বাঁকুড়া

পুরুলিয়া

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১৪ জুন, ২০১৯ বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত দু'ঘণ্টার বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী।

এইসব কিছুর মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের কর্মচারী বন্ধুরাও উপলব্ধি করছেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি শুধুমাত্র অনুকূল সময়ে একের পর এক দাবি আদায়ের চ্যাম্পিয়ন সংগঠন নয়, প্রতিকূলতার মধ্যে অর্জিত অধিকার রক্ষার অকুতোভয় লড়াইয়েও এই সংগঠনের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এই অভিজ্ঞতাকে ধারন করেই রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে প্রায় পাঁচ মাস ধরে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও মহকুমায় এবং কলকাতার সেক্টরগুলিতে সমস্তপ্রতিকূলতাকে ভেদ করে সর্বস্তরের কাঠামোকে সচল রাখতে কর্মচারী সমাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানসিক ও শারীরিক আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সংগঠনের নেতা-কর্মী-অনুগামী কর্মচারী সমাজ মতাদর্শের উপর অটুট থেকে সংগঠনের পুনর্গঠনকে সংগ্রাম হিসেবে দেখে নিজস্থলে সম্মেলন করতে বদ্ধ পরিকর। সংগঠনের প্রবীণ সংগঠক-নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা এবং তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহারে সক্ষম নবীন প্রজন্মের গতিশীলতা, সাহসকীকতা, সহনশীলতা ও ঝুঁকি নেবার মানসিকতার সমন্বয়ে সংগঠনের কাঠামোকে গতিশীল রাখতে গঠিত হবে নতুন কমিটি। যে কমিটি শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কর্মচারী সমাজের প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় লড়াইয়ের ময়দানে যুক্ত করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান শক্তি তার সংখ্যা। সেই সংখ্যাকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালনা করাই ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কাজ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতিকে উদারবাদী অর্থনীতির দ্বারা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের স্বার্থে ব্যবহার করার ফলে স্থায়ীপদে স্থায়ী নিয়োগের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। শ্রমিক কর্মচারীর বিন্যাসের মধ্যেও ঘটে চলেছে বিশাল পরিবর্তন। চুক্তি ও এজেন্সি প্রথায় ব্যাপক নিয়োগ হচ্ছে। এমনকি স্থায়ী পদেও চুক্তিতে নিয়োজিত হচ্ছে। সংগঠনের কাছে বর্তমান সময়ে যা এক ভয়াবহ সমস্যা আকারে দেখা দিচ্ছে, এমনকি চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের 'সমকাজে সমবেতন' প্রদানে মহামান্য উচ্চন্যায়ালয়ের নির্দেশকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এইসব কর্মচারীদের আদায়যোগ্য দাবিকে বাস্তবায়িত করতে সংগঠনকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই এই মুহূর্তে নবনিযুক্ত স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মচারীদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সর্বস্তরে সংগ্রাম-আন্দোলন জারি রাখা একান্ত জরুরি।

সামগ্রিক এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে সারা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে আমরাও সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে অগ্রসর হবে। তাই সমস্ত ভয়-ভীতি পরিহার করে সাহসের সাথে আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের সাথে নিবিড় জনসংযোগের মাধ্যমে উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে সমগ্র কর্মচারী সমাজের কাছে পৌঁছে 'সম্মেলন তহবিল' সংগ্রহ অভিযান সফল করতে হবে। 'সম্মেলন তহবিল' সংগ্রহের লক্ষ্য সম্মেলনের বহিরাঙ্গ জাকজমকপূর্ণ করা বা প্রতিনিধিদের আপ্যায়ন করার লক্ষ্যে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর হওয়া নয়। এর মাধ্যমে কর্মচারীর মানসিক সমর্থন পাওয়া। কর্মচারীর সাথে নিবিড় যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম তহবিল সংগ্রহ। কর্মচারীর মননে প্রবেশ করে সংগঠনের আদর্শ ও নীতিগত অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা। ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনাবলীর দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে করণীয় কর্তব্য নির্ধারণ করা। 'তহবিল সংগ্রহ' মানে নিছক অর্থ সংগ্রহ নয়, আগামী বৃহত্তর সংগ্রামের সংগ্রামী সৈনিকে রূপান্তরিত করা।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময়ের ইতিহাস আত্মত্যাগ ও চেতনাসমৃদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাস। আত্ম-সমর্পণ শব্দটি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অভিধানে নেই। তাই অনুগামীদের সমস্যা সমাধানে আগামীদিনে ঊন্নত ধরনের সংগ্রাম গড়ে তুলতে চাই ঊন্নত ধরনের চেতনা নির্ভর লড়াই। এই লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হবে ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন। একইসাথে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় এই বার্তা দেওয়া—

তোমার কাজ আগুনকে ভালোবেসে
উন্মাদ হয়ে যাওয়া নয়—
আগুনকে ব্যবহার করতে শেখা।
অস্থির হয়ো না, শুধু প্রস্তুত হও।

সেই পথ দেখাবে উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

গণআন্দোলনই একমাত্র পথ

এর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের আমেথি কেন্দ্রের সাথে কেরালার ওয়ানাড কেন্দ্রেও রাহুল গান্ধী নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জিদও গ্রহণ করেন। আগামী দিনে বামপন্থীদের সাথে কোনও ধরনের সরকার গঠনে কংগ্রেস দল সিদ্ধান্ত নেবে না— এটি ছিল তারই ইঙ্গিত। বিজেপি বিরোধী ভোটারদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া ভাল হয়নি। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা পরস্পরের জেতা আসনে প্রার্থী দেবে না, বামপন্থীদের দেওয়া এই প্রস্তাবকে কংগ্রেস দল প্রত্যাখ্যান করে।

এছাড়া আর এস এস - বি জে পি'র আগ্রাসী হিন্দুত্বের মোকাবিলায় কংগ্রেস নরম হিন্দুত্বের পথ গ্রহণ করেছিল। বিগত পাঁচ বছরে ধর্মনিরপেক্ষতা যা সংবিধানে বর্ণিত আছে, তাকে রক্ষার জন্য কংগ্রেস দল কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটি যে মতাদর্শগত একটি প্রসঙ্গ কংগ্রেস দল তাকে স্বীকারও করে না। পরন্তু উগ্র হিন্দুত্বের মোকাবিলায় নরম হিন্দুত্বের পথ অর্থাৎ মন্দিরে পুজো দেওয়া বা সাধু-সন্তদের সমাবেশ করা প্রভৃতি পথ গ্রহণ করা হয়েছে। এক কথায় বলা চলে যে, বি জে পি - র হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করতে পারেনি।

তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ব্যতীত অধিকাংশ রাজ্যের আঞ্চলিক দল পরিচালিত সরকারগুলির ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েছে বি জে পি। ফলে অধিকাংশ আঞ্চলিক দলগুলি এই নির্বাচনে সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

তিন

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল বামপন্থী দলগুলির নির্বাচনী বিপর্যয়। বিশেষত বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাঁটি বলে পরিচিত পশ্চিম বাংলায় এই বিপর্যয় নজিরবিহীন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম এরকম ফলাফল হলো।

পশ্চিমবাংলায় ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই বামপন্থীদের শক্তিক্ষয় শুরু হয়েছিল। ঐ পঞ্চায়েত নির্বাচনে চারটি জিলা পরিষদ বামপন্থীদের হাত ছাড়া হয়। আরও চারটি জিলা পরিষদে বামপন্থীরা জয়ী হলেও পঞ্চায়েত সমিত ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বামফ্রন্টের বিপর্যয় ঘটে। এই আটটি জিলা পরিষদ এবং কোলকাতার কোনও লোকসভা আসনে ২০০৯ সালে বামফ্রন্ট জয়ী হতে পারেনি। পরবর্তীকালে এই বিপর্যয় ধারাবাহিক ভাবেই চলতে থাকে।

এই বিপর্যয়কে প্রতিহত করতে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক আন্দোলনগত এবং মতাদর্শগত কর্মসূচী বিগত ৮-৯ বছরে ধরে গৃহীত হয়েছে। বিগত ২০১৪ সালের পর তিনটি সর্বভারতীয় সাধরণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সংগ্রাম গড়ে তোলার সংগঠনকে নির্বাচনী সংগঠনে পরিণত করা যায়নি।

তবে এবারে এই রাজ্যে বামপন্থীদের নির্বাচনী বিপর্যয়ের প্রধান কারণ তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ। তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচারে রাজ্যের মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য, রাজ্যে বেকারী সীমাহীন, কর্ম সংস্থানের কোনো সুযোগ নেই, সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন উভয়েই তৃণমূল কংগ্রেসের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রচার মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচার চালানো হয়েছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে বি জে পি-ই একমাত্র ভরসা। তবে এর পাশাপাশি সাংগঠনিক দুর্বলতাও বিদ্যমান ছিল।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে বামপন্থীদের বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে বামপন্থার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে। কিন্তু বামপন্থীদের নির্বাচনী বিপর্যয় এবং বামপন্থার প্রাসঙ্গিকতাকে কখনো এক করে দেখা যায় না। কারণ বামপন্থী আন্দোলন শুধুমাত্র সংসদে কিছু আসন পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; সংসদের বাইরে অর্থাৎ ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে যে প্রতিদিন আন্দোলন চলছে, বামপন্থার প্রাসঙ্গিকতা তার মধ্যেও জীবন্ত হয়ে রয়েছে। ১৯৭২ সালে জাল-জুয়াচুরি পূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনকে বামপন্থীরা অস্বীকার করে এবং পাঁচ বছর সব ধরনের সংসদীয় কাজকর্ম থেকে এই রাজ্যে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা বিপুলভাবে জয়ী হয়। বিধানসভা নির্বাচনে তৎকালীন ২৪০টি আসনের মধ্যে ২৩১টি আসনে বামপন্থীরা জয়ী হয়েছিল। সংসদীয় কাজকর্ম থেকে দূরে থাকলেও সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। একইভাবে ২০০৯ সাল থেকে রাজ্যে বিভিন্ন নির্বাচনে বামপন্থীদের গণভিত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও এই সময়ে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটসহ কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়েছে। একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বামপন্থা এক মতাদর্শ, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক হাতিয়ার, এক ভিন্ন ধরনের আন্দোলন। নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের ওপর সবসময়ই তা নির্ভরশীল নয়।

এ রাজ্যে নির্বাচনী বিপর্যয়ের প্রভাব পোস্টাল ভোটের ওপরেও পড়েছে, যাকে অবশ্যই হিসেবের মধ্যে নিতে হবে। ২০১১ সাল বা তারপরে অনুষ্ঠিত বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে, ই ভি এমে প্রাপ্ত বামপন্থীদের ভোটের হারের চেয়ে পোস্টাল ভোটে প্রাপ্ত বামপন্থীদের ভোটের হার অনেক বেশি থাকত। কিন্তু এবারে তার ব্যাপক ব্যতিক্রম দেখা গেছে। এক লক্ষের কিছু বেশি পোস্টাল ভোট এবারে পড়েছে। এর মধ্যে বি জে পি পেয়েছে ৬৮,৩৯৮টি ভোট, তৃণমূল কংগ্রেস ২৫,৩৯১টি, বামপন্থীরা পেয়েছে ৭,৬৫৪টি ভোট এবং কংগ্রেস পেয়েছে ৫,৬৭৪টি ভোট। এ এক ব্যতিক্রমী চিত্র। কিন্তু কেন এরকম হলো?

এর দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, বিপুল পরিমাণ বকেয়া মহার্ঘভাতা, বিলম্বিত ষষ্ঠ বেতন কমিশন, নবান্নে বিক্ষোভ দেখানোর অপরাধে (!) রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার এবং কয়েকদিনের মধ্যে দার্জিলিংয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং মুর্শিদাবাদে বদলী, বা বিভিন্ন স্তরের সংগঠক, কর্মী এমনকি সাধারণ কর্মচারীদের হয়রানিমূলক ও প্রতিহিংসামূলক বদলী, কর্মচারী শিক্ষক সমাজের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর ঘৃণাসূচক আচরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ক্ষুব্ধ কর্মচারী শিক্ষকরা তৃণমূল কংগ্রেসকে শিক্ষা দিতে বি জে পিকে ভোট দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, বি জে পি-আর এস এস-এর হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী প্রচারে জনগণের বড় অংশের ন্যায় কর্মচারী শিক্ষক সমাজও বিভ্রান্ত হয়েছেন।

উভয়ক্ষেত্রেই সংগঠনের সাংগঠনিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। প্রথমত বকেয়া মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ প্রভৃতির দাবীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ধারাবাহিক আন্দোলন করেছে। রাজ্য প্রশাসনে বি জে পি-র কোনো সংগঠন সেই অর্থে নেই। সুতরাং এই বিষয়টি উপেক্ষা করেই কর্মচারী ও শিক্ষক সমাজ যদি বিজেপিকে ভোট দেয়, তবে তা ভ্রান্ত এবং কর্মচারীদের চেতনার পশ্চাৎপদতার প্রতীক ছাড়া আর কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, বি জে পি-আর এস এস-এর আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারের শিকার যদি কর্মচারী সমাজ হয়ে থাকে, তবে সংগঠন, আন্দোলন, ঐক্য ও চেতনার সামনে তা এক বিপদ— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর জন্য কর্মচারীদের মধ্যে নিবিড় আদর্শগত প্রচার চালাতে হবে এবং ধারাবাহিক সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। কারণ 'নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ধাক্কা খেয়েছে' এই আনন্দে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক শক্তি এবং ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী আর এস এস পরিচালিত বি জে পি-র প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একে পুঁজি করেই আর এস এস কর্মচারী সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। তাই এই বিষয়ে গভীর আলোচনার প্রয়োজন।

চার

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ও তার ফলাফলের মধ্য দিয়ে সারা দেশ ও জাতি এখন চারটি প্রধান বিপদের সম্মুখীন। প্রথমত পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দেশি-বিদেশী কর্পোরেট হাউসের দেওয়া অর্থ ও সমর্থনের মধ্যে দিয়ে বি জে পি এই জয় অর্জন করেছে। সুতরাং নরেন্দ্র মোদি সরকার এদের স্বার্থে আর্থিক সংস্কার নীতি গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যেই নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে ১০০ দিনে কাজের যে পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর ইঙ্গিত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ, তথাকথিত জমি ব্যাঙ্ক গঠন করে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির হাতে কৃষি জমি তুলে দেওয়া, শ্রম আইনের সংস্কার প্রভৃতি। এসবের পরিণতিতে জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে। ফলে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিগত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদি সরকারের শাসনকালে দেশের সাংবিধানিক সার্বভৌম সংগঠনগুলির শীর্ষপদে আর এস এস-এর লোকেদের বসানো হয়েছে। আগামীদিনে এই প্রক্রিয়া আরো তীব্র হতে বাধ্য। লক্ষ্য হবে দেশের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রকে আর এস এস-এর চাহিদা অনুসারে 'হিন্দুরাষ্ট্র'-এ পরিণত করা। সুতরাং দেশের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সংহত করে এর মোকাবিলা করতে হবে।

তৃতীয়ত, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ আরও বৃদ্ধি পাবে, ফলে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ বৃদ্ধি পাবে। এমনকি এর ফলে তাদের জীবন-জীবিকা আক্রান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং আমাদের সংবিধান বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা এবং তাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

চতুর্থত, বি জে পি তার সমগ্র নির্বাচনী প্রচারে ভারতে একটি 'নিরাপদ রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলে। একে সামনে রেখে ব্যক্তির অধিকার বিশেষত ভিন্ন মতের অধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। ইতোমধ্যে এর অশুভ ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। যে কোনো অজুহাতে সংখ্যালঘু, দলিত সম্প্রদায়ের ওপর ভাড়াটে বাহিনীর আক্রমণ সংগঠিত হবে।

পূর্বোক্ত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করতে ব্যাপক সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে, কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে এই আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। একই সাথে কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে। শুধু কর্মচারীই নয়, তাদের পরিবার-পরিজনদেরও সংগঠনের বৃত্তের মধ্যে টেনে আনতে হবে। আগামী দিনে ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। একথা নিশ্চিত যে বি জে পি-আর এস এস-এর তীব্র ও আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক প্রচারকে প্রতিহত করতে পারে একমাত্র বামপন্থীদের নেতৃত্বে বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি। আগামী দিনে সেই সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। □

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

ভারতের সমন্বয়ী ঐতিহ্য

ধর্মান্তরিতর পথে না গিয়ে, পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে এবং বিভিন্ন ধর্মমত উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হন। ইবন-আল-আরাবির দর্শনের অনুগামীরাও ধর্মীয় বিরোধ দূর করার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেন। তাঁর কথা এই নিবন্ধে একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক আমলেও পরিবর্তিত পরিবেশে এই সমন্বয়ী ঐতিহ্যের ধারাটি বহু মনীষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধাদের ঐকান্তিক প্রয়াসে প্রবহমান থাকে। এই বিষয়ে খুবই সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি। উল্লেখ্য এই, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের এই ধারাটির নানা উপাদান পরিস্ফুট হয়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যেসব ভাবনা-চিন্তার অগ্রগতি ঘটে তাতে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। কবি লালন শাহ এবং অন্যান্য বাউল সাধক ও মরমী কবি রচিত অসংখ্য গান গ্রাম বাংলায় উদার-মানবতাবাদী ভাবধারা প্রচার করে। বাংলার বাইরেও দেধরাজ, পলটু, সাহব প্রমুখ সাধকরা এই ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। মধ্যযুগের সাধকদের মত তাঁরাও নির্ভীকভাবে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। লোক সংস্কৃতির এই ধারাটির প্রভাবের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন : ''এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরানে-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাঙলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।''

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় চিন্তা এক উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। ধর্ম চর্চার মাধ্যমে কেশব চন্দ্র সেন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়কে পরস্পরের নিকটতর করে এক নতুন মানব পরিবার গঠন করতে প্রয়াসী হন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব ধর্ম সমন্বয় ও মানবতাবাদের আদর্শ উজ্জীবিত করে মানব সমাজকে এক নতুন পথে চলতে উৎসাহিত করেন। মধ্যযুগের সাধকদের মত তিনিও বলেন, মানুষের সেবা হল ঈশ্বরের সেবা। 'যত্র জীব, তত্র শিব', এই মন্ত্র তো তাঁরই কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। তাঁর প্রচারিত 'যত মত তত পথ' তত্ত্ব ধর্মীয় চিন্তায় এক নতুন গতিধারা সৃষ্টি করে। তাঁরই প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর ধর্মচিন্তাকে দেশে ও বিদেশে ব্যাপ্ত করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিকাগোর ধর্মমহাসভার অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, ''সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বার বার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইল মানব সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত''। তিনি গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করে এই কথাও বলেন ঃ ''শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিতে হইবে ঃ 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মত বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।'' শ্রী অরবিন্দ সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ধর্মের সমালোচনা করে বলেন, 'যদি ধর্ম সর্বজনীন না হয়, তা চিরন্তন হতে পারে না। একটি সঙ্কীর্ণ ধর্ম, একটি সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ধর্ম, একটি স্বতন্ত্র ধর্ম কেবলমাত্র একটি সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য এবং একটি সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য টিঁকে থাকতে পারে'। 'সনাতন ধর্ম' ব্যাখ্যায় শ্রী অরবিন্দ সর্বজনীনতার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এই কথাও স্পষ্ট করে বলেন, এই সনাতন ধর্মের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্র থাকলেও, তা বাইবেল ও কোরান ধর্মগ্রন্থ অস্বীকার করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়, গানে ও অন্যান্য রচনার মাধ্যমে ধর্ম নির্ভর ঔদার্যবোধের, মানবিকতাবোধের ও যুক্তিশীলতার এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পথটিকেই প্রশস্ত করেন। কাজী নজরুল ইসলামও এই ধারাটিকে পরিস্ফুট করেন। ঢাকার 'শিখা' গ্রুপ বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন সংগঠিত করে মুসলিম মননকে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের সময়ে যে লোকসংস্কৃতির ধারার উদ্ভব ঘটে তার মধ্যেও সমন্বয়ী উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের ফলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবধারাকে অটুট রেখে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের প্রক্রিয়া এই সমন্বয়ী ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই শক্তি সঞ্চয় করে। শ্রী অরিবন্দ, মাহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফ্‌ফর খান, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু এবং কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ এই সমন্বয়ী ঐতিহ্যের ভিতের ওপর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে এক নতুন ভারত গঠন করতে প্রয়াসী হন। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব না হলেও স্বাধীন ভারতে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছে তা এই ঐতিহ্যেরই ফসল। এই সমন্বয়ী ঐতিহ্যকে যদি আমরা আধুনিক জীবনের উপযোগী করে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি তাহলে আগামীদিনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা অনুযায়ী এক নতুন বিশ্ব গঠনের কেন্দ্র হবে ভারতবর্ষ। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা সংগঠনের

বিধানসভায় তাঁর নিজকক্ষে আলোচনার জন্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদককে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাই সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ এবং যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী বিধানসভা ভবনে উপস্থিত হন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশনের পাশাপাশি যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হলো, শাসকদলের অনুগামীদের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ ও আলিপুরদুয়ারে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর যথাক্রমে আগুনে পুরিয়ে দেওয়া ও জবর দখল। আন্দোলন চলাকালীন লবণহ্রদের স্বাস্থ্যভবনে হেলথ ডাইরেক্টরেটের কর্মচারী কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পরেও তাঁর পরিবারের পোষ্যের চাকরি না হওয়া এবং নবান্নের অভ্যন্তরে টিফিন বিরতিতে শুধুমাত্র স্লোগান দেওয়ার জন্য সংগঠনের ১৮ জন শীর্ষ নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী পর্বে তাঁদের মধ্যে ১৫ জনকে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্যায়ভাবে বদলি করার প্রসঙ্গটি। মুখ্যমন্ত্রী মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশন সম্পর্কে সদর্থক বিবেচনার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি, দপ্তর জবর দখল, অনৈতিক বদলি ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যকে চাকরি দেওয়ার বিষয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। আলোচনার সময় রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। □

ভারতের সমন্বয়ী ঐতিহ্য

ডঃ অমলেন্দু দে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু দে'র এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০১ সালে মালদহ জেলায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায়। লেখাটির বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো।

বহু ধর্মী ভারতে সমন্বয়ের ঐতিহ্য সবসময়ে প্রবহমান ছিল। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সম্প্রতি এই ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। জনমানসে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মধ্যযুগের ঘটনাবলী উল্লেখ করে আমাদের জীবনধারার এই প্রবাহকে অগ্রাহ্য করার প্রয়াস চলছে। স্বভাবতই তথ্যনির্ভর আলোচনারও অভাব ঘটছে। এই কথা মনে রেখেই আলোচ্য বিষয়ের ওপর সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে ভারতীয় জীবনধারায় প্রধানত তিনটি উপাদানের উদ্ভব ঘটে; যথা---সংঘাত (Conflict), পরস্পরের গুণের সমাদর (mutual appreciation) ও সদৃশকরণ (assimilation)। প্রথমদিকে রাজ্যজয়ের ও আধিপত্য স্থাপনের সময়ে সংঘাতের উপাদানই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু প্রাধান্য স্থাপনের পর রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে মুসলমান শাসকদের হিন্দু-প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। একই রাজ্যে বসবাস করার ফলে তাদের পরস্পরের পরিচয় হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার সময় এই যোগাযোগের ও পরিচয়ের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়কালে এক সম্প্রদায়ের প্রভাব অন্য সম্প্রদায়ের ওপর পড়ে। তার এক স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া যায়। সংঘাতের ক্ষেত্রটি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং পরস্পরের গুণের সমাদর ও সদৃশকরণের উপাদানগুলো ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। তার ফলে ভারতীয়ত্বের (Indianism) রূপ পরিস্ফুট হয়। এই সময়ে ভারতে মুসলিম জনবিন্যাসেও পরিবর্তন ঘটে। বিদেশ থেকে আগত মুসলমানরা ভারতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। বর্ণভেদ প্রথায় পীড়িত ও নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের সাম্যনীতির আকর্ষণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে মুসলিম জনবিন্যাসেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বহিরাগত মুসলমানদের তুলনায় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ভারতীয় মুসলিম জনবিন্যাস নতুন আকৃতি ধারণ করে। ক্রমশ বহিরাগত মুসলমানদের সংখ্যা আরও হ্রাস পায়।

এই প্রেক্ষাপটেই মধ্যযুগের ভারতের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে সমন্বয়ের উপাদানগুলো আলোচনা করা যাক। রাজতন্ত্র সম্বন্ধে মুসলিম শাসকদের কী ভাবনা ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একাদশ শতাব্দীর সূচনায় ফিরে তাকাতে হয়। ১০১০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ইরানীয় কবি ফিরদৌসীর 'শাহনামা' রচনার কাজ শেষ হয়। এই বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি শাসক ও রাজনৈতিক তত্ত্ববিদদের চিন্তাকে এক নতুন দিকে প্রবাহিত করেন। তার ফলে ইসলামিক রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। রাজতন্ত্রের আলোচনায় বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। রাজা ততদিনই ঐশ্বরিক আনুকূল্য লাভ করেন যতদিন না তা ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেন। এই গ্রন্থে প্রাচীন ইরানের রাজাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। জামসিদ নামে একজন বিখ্যাত রাজা ইরানে ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভ করেছেন। তিনি এই কথাও বিশ্বাস করেন যে, একই সঙ্গে তিনি রাজা ও পুরোহিত। তাঁর দায়িত্ব হলো, দুর্বৃত্তদের দমন করে প্রজাদের রক্ষা করা, আর পাপীদের সৎপথে পরিচালনা করা। সুতরাং ঐশ্বরিক আনুকূল্য লাভের অধিকারী রাজা একজন সুশাসক হিসেবেই বিরাজ করবেন। প্রাচীনকালে ইরানে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে এই ধারণাই গুরুত্ব পায়। 'অবেস্তা' ধর্মগ্রন্থেও এই তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজতন্ত্র সম্বন্ধীয় এই তত্ত্ব এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আবু হামিদ মুহম্মদ অল-ঘাজালির (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ) মত গোঁড়াপন্থী পণ্ডিতও তা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আরবি, ফারসি ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজার প্রধান কর্তব্য কী, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনা চলে। এই কথা বলা হয়, রাজার প্রধান কর্তব্য হল ন্যায়বিচার সাধন করে রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করা। এই আলোচনায় অনেকেই অংশগ্রহণ করলেও যে দু'জন পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন---নিজামউল-মুলক টুসি (১০১৮-৯২ খ্রিঃ) ও আবু বকর মুহম্মদ বিন অল-ওয়ালিদ অল টুরটুসি (১০৫৯-১১২৭ খ্রিঃ)।

তৈমুর ও আকবরের রাজত্বকালের মধ্যে রাজনৈতিক তত্ত্বের দুটো প্রধান ধারা দানা বাঁধে—একটি হল ঘাজালিয়ান এবং অন্যটি হল দার্শনিক। দ্বিতীয় ধারাটিকে আরও সজীব করেন দার্শনিক ইবন সিনার (৯৮০-১০৩৭ খ্রিঃ), বিখ্যাত টীকাকার খাজা নাসিরউদ্দিন টুসি (১২০১-৭৪ খ্রিঃ)। ঘাজালিয়ান তত্ত্বের সঙ্গে নাসিরিয়ান রাজনৈতিক দর্শনের সমন্বয় সাধন করেন আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২ খ্রিঃ)। সম্রাট আকবরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আবুল ফজল বিভিন্ন ধর্মের প্রজা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত রূপদানে উদ্যোগী হন এবং রাজনৈতিক আদর্শের বিভিন্ন ধারাকে সমন্বয় করে নবরূপ দান করেন। তিনি ন্যায়নীতির ওপর রাজতন্ত্রকে স্থাপন করেন। সকলের পক্ষে উপযোগী করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার ফলে অ-মুসলমানরাও মুঘল শাসনকে মেনে নেয়। প্রশাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল পদেও হিন্দুরা অধিষ্ঠিত হন। মুঘল সম্রাটরা নিজেদের 'ভারতীয়' বলে মনে করেন এবং তাঁরা 'হিন্দুস্থানের সম্রাট' এই পদবী ধারণ করে গর্ববোধ করেন। আর তাঁদেরই প্রয়াসে ভারতে 'একটি সুসংহত প্রশাসনিক ঐতিহ্য' গড়ে তোলা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আকবর 'সুল-ই-কুল' বা সর্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন। ইবন অল-অরাবির (১১৬৫-১২৪০ খ্রিঃ) দর্শনের অনুগামীরা যে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিরোধ দূর করা। আকবর এই আদর্শকে তাঁর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর বিশ্বজনীন নীতির ভিডিও হল এই আদর্শ। তাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই কারণে বাইরে থেকে যেসব মুসলমান তখন ভারতে আসতেন তাঁরা এই রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা লক্ষ্য করে মনে করতেন, 'ইসলামের তরবারি চালনা করছে হিন্দুরা'। স্বৈরতন্ত্রকে শাসনতান্ত্রিক-বিধি ব্যবস্থা মধ্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হওয়ায় মুঘল সম্রাটদের কর্তৃত্ব দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে। একসঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে উত্তর ভারতের অনেক জায়গাতেই হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর একটি 'হিন্দুস্থানী জীবনধারা' গড়ে তোলে। এইসব লক্ষ্য করেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাবর মন্তব্য করেন, ভারতে সব কিছুই চলছে 'হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে'।

মধ্যযুগে ভক্তি ও সুফী আন্দোলনের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ধর্ম নির্ভর ঔদার্যবোধের, মানবিকতাবোধের ও যুক্তিশীলতার পথ প্রশস্ত হয়। একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে ভক্তি আন্দোলন হিন্দু সমাজে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমগ্র ভারতে অসংখ্য সাধকের আবির্ভাব ঘটে। রামানন্দ, কবীর, দাদু দয়াল, চৈতন্যদেব, গুরু নানক, রজ্জব, শংকরদেব প্রভৃতি সাধকরা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তারা ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবসেবার আদর্শ প্রচার করেন। সাধকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিম্নবর্ণের। তাঁদের মুসলমান শিষ্যও ছিলেন। প্রায় একই সময়ে সুফী মতবাদও প্রচারিত হয়। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তারে সুফীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সুফীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তী আজমীরে বাস করতেন। তাঁর অনুগামী সুফীদের চিস্তী সম্প্রদায় বলা হত। মৈনুদ্দীন চিস্তী তাঁর শিষ্যদের বলতেন, ''উচ্চ পর্যায়ের ঈশ্বরের আরাধনা হল জনসাধারণের দুর্গতি দূর করা, অসহায়ের প্রয়োজন মেটানো এবং ক্ষুধার্তদের আহার দেওয়া।'' তিনি তাঁর শিষ্যদের ''নদীর মত ঔদার্য, সূর্যের মত অনুরাগ এবং পৃথিবীর মত আতিথেয়তা আয়ত্ত করতে'' বলতেন। এমন কি চিস্তী সাধকরা শাসকদের দেশ শাসনে বৈষম্যমূলক নীতি পরিহার করতে বলতেন। স্বভাবতই চিস্তী-ধর্মচিন্তার সঙ্গে হিন্দু-ধর্মচিন্তার সংযোগ স্থাপন সহজেই ঘটে। হিন্দু যোগী ও সুফী সাধকরা ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রটিকে অনেকটা ব্যাপ্ত করেন।

আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণের কাহিনী আলোচিত হয়। তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে মুসলমানদের হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করান। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থও ফারসিতে অনূদিত হয়। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে হিন্দুদের পরিচিত করার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। যুবরাজ দারা শুকো সংস্কৃত শিখে উপনিষদ ফারসিতে অনুবাদ করেন। তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মনির্ভর ঔদার্যবোধের ধারাটিকে সজীব করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা বর্জন করে যাতে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে চলতে পারে তার জন্য তিনি 'মাজমা উল বাহারাইন' নামে এক আকর্ষণীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

সুলতানী আমলে পারসী ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাগুলোরও বিকাশ ঘটে। হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রাধান্য হ্রাস পেলেও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে বিভিন্ন ভাষায় যেসব সেকুলার সাহিত্য রচিত হয় তার মধ্যেও সমন্বয়ী উপাদান পাওয়া যায়। উল্লেখ্য এই ইসলামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশের শিল্পরীতি আয়ত্ত করে নিজেদের শিল্পরীতিকে উন্নত করে। ভারতে আসবার আগেই সারাসিনীয় স্থাপত্য শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। তার সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের মিলনে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প নবরূপ ধারণ করে। এই মিশ্রণকে ইন্দো-সারাসিনীয় স্থাপত্য রীতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। লোদী স্থাপত্য রীতিতে হিন্দু প্রতিভার সংমিশ্রণ হওয়ায় 'প্রাণের ও ভাবের' সঞ্চার ঘটে। এই ধারাটিই মুঘল যুগে আরও ব্যাপ্তিলাভ করে। অবশ্য ভারতের বহু স্থানে আঞ্চলিক শিল্পরীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। কোথাও আবার সামরিক স্থাপত্যে ইউরোপীয় ও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দীর্ঘকাল ধরে মুঘল সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকায় শিল্পকলার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়। কয়েকটি অঞ্চলের সংস্কৃতিও বিশিষ্টতা লাভ করে। বাবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত সব ক'জন সম্রাটই এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সময়ে স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে ভারতীয় ও বিদেশী রীতির সংমিশ্রণ ঘটে। আকবর শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীয় পদ্ধতিকে উৎসাহিত করেন। তিনিই উদ্যোগী হয়ে বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীদের আঁকা চিত্রের সাহায্যে 'বাবর-নামা' গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেন। বাবর রচিত আত্মজীবনী 'বাবর-নামা' চাঘতাই-তুর্কি ভাষায় লিখিত হলেও তা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয় এবং সর্বযুগের সাহিত্য সম্ভারে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়। প্রকৃতি-প্রেমী বাবর ভারতের নানা প্রকার প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুল দেখে আনন্দ লাভ করেন এবং তার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই কারণে বাবরকে ভারতের 'প্রথম প্রাকৃতিক ইতিহাস বিজ্ঞানী' বলা হয়। আর আকবরের সময়ে রচিত 'পেইনটিংস অব দি বাবর-নামা' গ্রন্থ বিশ্ব সভ্যতার এক অমূল্য শিল্প সম্পদ। বারো খণ্ডে রচিত 'হামজা-নামা' পুঁথির ১,০০৪ পৃষ্ঠা চিত্র শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়। 'আকবর-নামা' এবং ফারসি ভাষায় অনূদিত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় শিল্পীদের আঁকা ছবি হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীদের যৌথ প্রয়াসের ফসল বলা যায়। দারা শুকো ইউরোপীয় শিল্পের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁর শিল্পীরা ইউরোপীয় শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত হন। জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে তার প্রতিফলন চিত্রকলাতেও লক্ষ্য করা যায়। রাজপুত রাজদরবারের শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যগত ধারাকে আরও উন্নত করেন। হিন্দু ও মুসলিম রীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য দিক বলা যায়। ইন্দো-পারসিক শিল্পরীতির সমন্বয়কে অগ্রাহ্য করে কী মধ্যযুগের ভারতের শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা সম্ভব? এই ঐতিহ্যগত ধারার উত্তরাধিকারী তো সকল ভারতবাসীই।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সমন্বয়ী ধারার উদ্ভব ঘটে। প্রাক্-ইসলামীয় আরব দেশে সঙ্গীত তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। রাজ্য জয়ের ফলে ইসলামের যখন বিস্তার ঘটে তখন বাইজানটাইন ও ইরানীয় সঙ্গীতের ওপর প্রাক্-ইসলামীয় আরবীয়-সঙ্গীতের প্রভাব পড়ে। সঙ্গীত বিষয়ক তত্ত্ব ও তাকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রূপদানের বিষয়ে আরবি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন দার্শনিক অল-কিন্দী, অল-ফারাবি ও ইবন সিনা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ফারসি ভাষায় সঙ্গীত সম্বন্ধে দুটো গ্রন্থ রচিত হয়। নৃত্যও একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বারানীর বিবরণ থেকে জানা যায়। আমির খসরু (মৃত্যু ১৩২৫ খ্রিঃ) হলেন একজন বিখ্যাত কবি ও সুফী। তাঁর মতে, ভারতীয় সঙ্গীত অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উচ্চ পর্যায়ের ছিল। উল্লেখ্য এই, আরবদের দ্বারা ইরান জয়ের আগেই পারসো-আরব এবং ভারতীয় সঙ্গীতের মিশ্রণ শুরু হয়। সাসানীয় রাজা বাহরাম গুর (৪২১-৩৯ খ্রিঃ) তাঁর রাজ্যে হিন্দুস্তান থেকে দশ হাজার সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যশিল্পী এনে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁরাই জিপসীদের পূর্বপুরুষ, যাঁরা পরবর্তীকালে বাইজানটাইন ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বহু হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যদিও রাজদরবার থেকে সঙ্গীতজ্ঞদের ভরণপোষণ করা হত, তাহলেও বহু সঙ্গীতজ্ঞ সুফীদের সেবা করাই পছন্দ করেন। কারণ সুফীরা ছিলেন সঙ্গীতের গুণগ্রাহী পণ্ডিত। বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুফী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে আয় করেন ও ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুফী সাধকরা ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত ও কবিতাকে ফারসী ভাষায় রচিত সঙ্গীত ও কবিতা থেকে বেশি ফলপ্রসূ মনে করেন। অবশ্য পারস্য দেশীয় সঙ্গীত ও কবিতাকে কখনও অবহেলা করা হয়নি। প্রধানত আমির খসরুর প্রয়াসেই নতুন ধরনের সঙ্গীতের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধার দুয়ার খুলে যায়। সঙ্গীতের এই ধারাটিকে 'ইন্দো-পারসিয়ান' বলা হয়। আমির খসরু কর্ণাটক স্কুলের ধ্রুপদী 'দাক্ষিণাত্য সঙ্গীত' গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এই প্রাচীন ভারতীয় ধারার সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করেন।

ফিরোজ শাহর রাজত্বকালেও ভারতীয় ও পারস্য সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ অব্যাহত থাকে। গুজরাটের গভর্নর মালিক আবু রাজা উভয় সঙ্গীতের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি তাঁর রাজদরবারের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের আমন্ত্রণ করে ভারতীয় ও পারস্য সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর আঞ্চলিক রাজ্যের শাসকরাও সঙ্গীতের মস্ত বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে রচিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ 'সঙ্গীত শিরোমণি' জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শারকির নামে উৎসর্গিত হয়। হোসায়ন শাহ শারকি (১৪৫৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে) একজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের স্বরগ্রামের উচ্চতাদির মান, সুর ইত্যাদি বিষয়ে যেসব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তা হোসায়নি অথবা জৌনপুরী ঘরানা নামে খ্যাত। তিনি 'খেয়াল'-এরও উন্নতি সাধন করেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবিদিনও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর উৎসাহে 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের উপর টীকা সঙ্কলিত হয়। গোয়ালিয়রের রাজা মান সিংহ টোমার (১৪৫০-১৫২৮ খ্রিঃ) কেবলমাত্র সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ধ্রুপদ সঙ্গীতের হিন্দিতে স্বরপরিবর্তন করান। ধ্রুপদের সঙ্গীত-সংক্রান্ত ছন্দের সঙ্গে গ্রীক কবিতার ছন্দের ও ল্যাটিন ষড়মাত্রিক কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সঙ্গীতসংক্রান্ত ছন্দের রীতিকে 'চৌতালা' বলা হয়। রাজা মান সিংহ টোমারের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর দরবারের সঙ্গীতজ্ঞরা ভারতের অন্যান্য রাজ দরবারে 'রাগ' বিষয়ে তাঁদের ফলাফল প্রচার করেন। বাইজু নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ গুজরাটের বাহাদুর শাহর দরবারে যোগদান করেন। তিনি যে সঙ্গীত রচনা করেন তা তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নামে 'বাহাদুরি' বলে উল্লেখ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। কবীর রচিত সঙ্গীত থেকে একটি ধ্রুপদী রীতির উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। এই সঙ্গীত 'কবীরাই' নামে উল্লিখিত। আর একটি বিশেষ ধারা হল 'বৈষ্ণব সঙ্গীত' বা 'বিষ্ণু পদ' বলে পরিচিত। গুরু নানক রচিত স্তবগানেও আর একটি সমন্বয়ী ধারা পাওয়া যায়। তাঁর মুসলমান শিষ্য মারাদোনারও ভক্তিমূলক সঙ্গীতে পারদর্শিতা ছিল। দিল্লীর সুলতানী ও মুঘল শাসকরা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিকাশে সুলতান সিকন্দরের বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর সময়েই 'লাহজাত-ই সিকন্দরী' নামে সঙ্গীতের বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। উল্লেখ্য এই, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সুফীরা তাঁদের সঙ্গীত সভার জন্য ('সামা' বলা হত) হিন্দী কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। পরিমার্জিত হিন্দী সঙ্গীতের সঙ্গে পারস্য দেশীয় শিল্প দক্ষতা মিশ্রিত হওয়ায় ভারতীয় 'সুফী সামা' সঙ্গীত গভীরতা লাভ করে ও নতুন রূপ ধারণ করে। স্থানিক ভাষা আয়ত্ত করায় সুফীরা আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেন এবং হিন্দু ভক্তদের ভাবনার অংশীদার হন। তার ফলে হিন্দু ভক্ত ও হিন্দু সুফী কবিরা সমস্ত রকম গোঁড়ামি, ভণ্ডামি ও নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁরা

▶▶ *ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে*

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
48th Year, 2nd Issue, June 2019

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী

বাঁকুড়ায় রক্তদান কর্মসূচী

কোচবিহারে রক্তদান কর্মসূচী

ডাইরেক্টরেট সমিতি'র রক্তদান

আলিপুরদুয়ারে রক্তদান শিবির

পুরুলিয়া জেলায় স্বাস্থ্য শিবির

সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সমিতি'র রক্তদান

পুরুলিয়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উৎযাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির তিন শতাধিক পেনশনার্স ও ফ্যামিলি পেনশনার্সদের উপস্থিতিতে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ অনিল দত্ত। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য। সভা পরিচালনা করেন কাশীনাথ মজুমদার।

আলিপুরদুয়ার ঃ অরণ্য সপ্তাহকে কেন্দ্র করে গত ৭ জুলাই ২০১৯ আলিপুরদুয়ার জেলার কর্মচারী ভবনে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাবঅর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগিতায় রক্তদানের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ৬ জন মহিলা সহ মোট ৯৪ জন রক্তদান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ঃ গত ১১ জুলাই একই সাথে নবমহাকরণ ক্যান্টিন হল এবং লবণ হ্রদের স্বাস্থ্য ভবনে সমিতির উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। নব মহাকরণে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে সুমিত ভট্টাচার্য এবং স্বাস্থ্য ভবনে উদ্বোধন করেন গোপাল পাঠক। দুটি স্থান মিলিয়ে সর্বমোট ৮ জন মহিলা সহ ১০০ জন রক্তদান করেন।

বাঁকুড়া ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১২ জুলাই কর্মচারী ভবনে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক পার্থ ঘোষ। তিন জন মহিলা সহ মোট ৩৬ জন রক্তদান করেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন ঃ গত ১২ জুলাই ২০১৯ লবণ হ্রদের অরণ্য ভবনে সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে মানস কুমার বড়ুয়া। ১ জন মহিলাসহ মোট ৩৫ জন রক্তদান করেন। □

প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠালো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি
কেন্দ্রীয় দপ্তর ঃ ১২৫ রাজা রামমোহন সরণী,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ (রেজিঃ নং এস/৬৮৭৫৪)
ফোন নং ঃ (০৩৩) ২২৫৭-০৮৬৭

PASCHIM BANGA RAJYA SARKARI PENSIONERS SAMITY
Central Office : 125 Raja Rammohan Sarani,
Kolkata-700 009 (Reg. No. S/68754)
Phone No. : (033) 2257-0867

পত্রাঙ্ক ঃ
REF. No. 34/Pen-1/Samity/2019

তারিখ ঃ
DATED : 08-07-2019

To
The Honourable
Prime Minister of India
New Delhi

Respected Sir,

I, on behalf of our association, take the privilege to express our concern over the notification issued on 28th June 2019 where in the Government has reduced the interest rate on small savings schemes including those of Senior Citizens.

Your goodself might be aware that the pensioners and family pensioners as a whole earn a meagre amount of pension out of which more than 50% of that amount requires to be spent on medical treatment. Moreover the rising prices of essential commodities cause regular erosion of earnings and hardship to maintain their daily expenses. So, they are to depend on the interest earned from small savings schemes which they have saved from their pensionery benefits.

It is needless to mention that during last few years the interest rates on small savings schemes have been reduced on a regular basis. Under the circumstances, I request your kind favour to exempt the pensioners and family pensioners including other senior citizens from this reduction of interest rates on small savings and oblige.

Thanking you,
[signature]
Yours ever

স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমানোর কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে পত্র দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি। ঐ পত্রে সুদের হার কমার ফলে পেনশনার্স এবং ফ্যামিলি পেনশনার্সরা যে সমস্যার মুখোমুখি হবেন সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই পত্রে। একই সাথে তাঁর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে যাতে সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যারিত হয়। □

১৪ জুন ২০১৯ বিক্ষোভ কর্মসূচী

কোচবিহার

দার্জিলিং

হাওড়া

উত্তরাঞ্চল

মহাকরণ অঞ্চল

মালদা

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।